উজ্জ্বল স্মৃতি

হেনা দাস

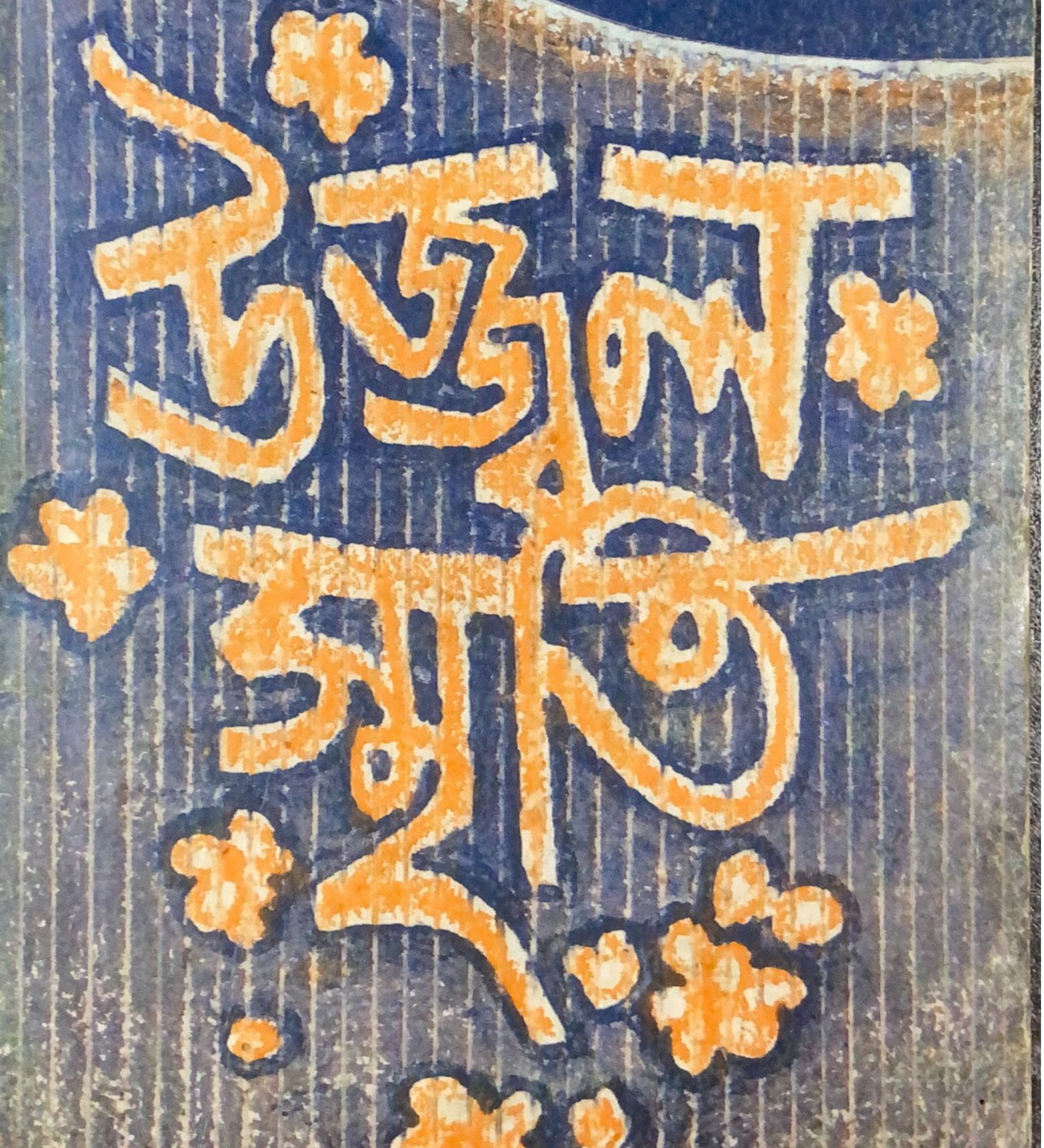

উজ্জ্বল স্মৃতি

হেনা দাস

মানব প্রকাশন
ঢাকা

উজ্জ্বল স্মৃতি
মানব প্রকাশন প্রকাশনা-১০

প্রকাশক : মানব প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : পৌষ ১৪০২/ডিসেম্বর ১৯৯৫
স্বত্ব : গ্রন্থকার
প্রচ্ছদ : মতলুব আলী
কম্পোজ-মুদ্রণ : প্রকাশ মুদ্রায়ণ
২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
স্ক্যান-প্রসেস : কালার স্ক্যান লিমিটেড
৩৪, পুরানা পল্টন [দোতলা], ঢাকা-১০০০
মূল্য : ৩৫/- টাকা

Publisher : Manab Prokashon, Dhaka, Bangaldesh.
First Published : Poush 1402/December 1995.
Cover Design : Matlub Ali.
Copyright : Reserved by the author.
Compose & Printing : Prokash Mudrayan .
2/2, Purana Paltan, Dhaka-1000.
Scan-Process : Colour Scan Limited.
34, Purana Paltan (1st Floor), Dhaka-1000.
Price : TK. 35/-
ISBN -984-8148-06-x

বর্তমান প্রজন্ম আমাদের অতীত ইতিহাস জানতে পারছে না। জানার সুযোগও কম। বাঙালী জাতির অতীত হচ্ছে গৌরবোজ্জ্বল লড়াই, সংগ্রামের।

অতীত ঘটনাবলীর উপর কিছু কিছু বই লেখা হয়েছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া একেকটি লেখা তৈরি হয়েছে এক এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বা কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই দেশের মেহনতী মানুষ তার মুক্তির লক্ষ্যে যে কত লড়াই-সংগ্রাম করেছে এবং জীবন দিয়েছে তার খতিয়ান আজও গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। সত্যেন সেনের 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', কমরেড মণি সিংহের 'জীবন সংগ্রাম' বই দু'টি থেকে কিছু কিছু জানা যায়। তাছাড়া কোন ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের অতীতকে লালন করছি না। অথচ লালন করা ছাড়া বর্তমান প্রজন্মের সামনে স্বদেশের ঐতিহাস-ঐতিহ্য সঠিকভাবে তুলে ধরার আর কোন পথ নেই। কি করে জানবে তারা আমাদের অতীত গৌরব গাঁথা ?

সচেতনভাবেই এখানে ইতিহাস বিকৃতির প্রচেষ্টা হচ্ছে। এমনকি স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চল্‌ছে। মিথ্যাকে ভিত্তি করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। তাই প্রয়োজন সত্যের উদ্‌ঘাটন। আর তাই নতুন প্রজন্মের কাছে আবেদন, অতীতের ইতিহাস তাদের অবশ্যই জানতে হবে – মনে রাখতে হবে এই দেশের ইতিহাস গড়ে উঠেছে মেহনতী কৃষক, শ্রমিক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের শ্রমে, ঘামে ও রক্তে।

কমরেড হেনা দাসের এই 'উজ্জ্বল স্মৃতি' বইটি নতুন প্রজন্মকে আমাদের গৌরবময় অতীত জানতে অনেক সাহায্য করবে। হেনাদি এই বয়সেও শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে যে নতুন প্রজন্মের জন্য এমন একটা প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হেনাদিকে শুভেচ্ছা।

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬

মোর্শেদ আলী
সভাপতি মন্ডলীর সদস্য,
কেন্দ্রীয় কমিটি,
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

মুখবন্ধ

আমার স্মৃতির জগতকে আজও যাঁরা আলোকিত করে আছেন, যাঁরা তাঁদের দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ–তিতিক্ষা, সংগ্রামী জীবন ও কর্মের দৃষ্টান্তে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে থেকে নয় জনের স্মৃতিচারণ দিয়ে আমার শ্রদ্ধার মালা গেঁথেছি এই সঙ্কলনে। এঁদের মাঝে মাত্র কয়েকজন সুপরিচিত বা স্বনামখাত, অধিকাংশই রয়ে গেছেন নেপথ্যে, খ্যাতির আড়ালে। আট জন এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, একজন নিখোঁজ। এই স্মৃতির তালিকায় আছেন বৃটিশ আমলের স্বাধীনতা সংগ্রামী, মহিলা নেত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নানকার নেত্রী, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ সঙ্গীতশিল্পী ও কবি এবং পাঁচজনই বৃটিশ আমল থেকে মেহনতী মানুষের মুক্তি–সংগ্রামে আত্মনিবেদিত কমিউনিস্ট, যাঁরা আবার পরবর্তী সময়ে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে যান। এই নয় জনের মাঝে সাতজনই হলেন সিলেটের সন্তান। সঙ্গত কারণেই সঙ্কলনে এঁদের আধিক্য ঘটেছে। কারণ আমি নিজেও সিলেটেরই মেয়ে এবং আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে সিলেটেরই মাটিতে এবং একটি উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে সেখানেই। এই সাতজনের মাঝে আবার দু'জন আমার পরিবারের সদস্য– একজন আমার স্বামী ও অন্যজন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানতুল্য তরুণ, যাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে এবং আত্মোৎসর্গে নিঃশেষ হয়েছে ভারতের মাটিতে। এই স্মৃতি সঙ্কলনে যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষাবিদ্, পি.এইচ.ডি. প্রাপ্ত প্রতিভাবান অধ্যাপক, আবার আছে একেবারে নিরক্ষর, সমাজে সবচাইতে নিষ্পেষিত শ্রেণীর এক বাঁদী নারীর কথা– বিভিন্ন মত–পথের অনুসারী ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থেকে আগত এই নয়জন স্মরণীয় নারী–পুরুষের মাঝে আমি খুঁজে পেয়েছি সাধারণ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য– যা হতে পারে আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস। গভীর দেশপ্রেম, মানবিক চেতনা, মানুষের দুঃখ–কষ্টে নিঃস্বার্থভাবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর মত মন ও ক্ষমতা, লক্ষ্য–আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সাচ্চা মানুষের গুণাবলী, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহস, ত্যাগ–তিতিক্ষা, দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবিরাম সংগ্রাম ও অমূল্য অবদান.... এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য এঁদের সবার মাঝেই দেখেছি। এঁদের মধ্যে আছেন সাচ্চা কমিউনিস্ট যাঁরা গোটা জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছেন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে, আবার এমনও

ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজ নিজ পেশায় থেকে সমাজকে, দেশকে শিক্ষায়-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর সাধনা করে গেছেন, আছেন এমন মহিয়সী মহিলা যিনি একদিকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, অন্যদিকে রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ভেঙ্গে নারীসমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন– আছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাহসী যুবক ও পাক্‌বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী শহীদ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী– যিনি অসহ্য শোকের যন্ত্রণা বহন করে অসাধারণ ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। আছেন নিষ্পেষিত এক নান্‌কার নারী– যিনি বর্বরতম নানকার প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজ দেশের সংকটময় রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেখে অনেকে হতাশ হন, অনেকে বলেন এসব মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা সংগ্রাম সবই মূল্যহীন ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কেউ কেউ সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কথাটা বলেন। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর যাঁরা ঐ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের কারো কারো মুখ থেকে কথাটা বেশী শোনা যায়। সংগ্রামের কঠিন পথে তাঁরা অনেকে যেতে চান না। সহজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অথবা ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে চান। ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ, সুবিধাবাদ ও উচ্চাভিলাষ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজকে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয়কে যারা প্রতিরোধ করতে পারত সেই সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এইসব দলের অতীতের ত্যাগী দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের অমূল্য অবদানের সঠিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। জাতি আজ হতাশাগ্রস্ত ও সাধারণ মানুষেরা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উপর ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলছেন অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি বহু সাফল্য। বহু শৃঙ্খল আমরা ভেঙ্গেছি, বৃটিশ ও পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করেছি, আমাদের দেশের সংগ্রামী মানুষ সমাজের বহু কুপ্রথা, সামন্ততান্ত্রিক নান্‌কতর প্রথা, টঙ্ক প্রথা ইত্যাদি উচ্ছেদ করেছে, ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করেছে, রক্ষণশীলতার অচলায়তন ভেঙ্গে নারীসমাজ প্রগতির পথে অনেকদূর এগিয়েছে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে চারটি মৌলনীতি – গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিক্‌-নির্দেশনা দিতে পেরেছে। নিঃসন্দেহে বলা চলে এসব সাফল্য ও বিজয় সম্ভব হয়েছে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার বিস্ফোরণে, প্রতিটি নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের সম্মিলিত আত্মত্যাগ ও অবদানে এবং অসংখ্য শহীদের রক্তক্ষরণে। কাজেই ব্যর্থ হয়নি কারো ত্যাগ ও আত্মদান। কিন্তু তবু কেন আমরা আবার পিছিয়ে যাচ্ছি, আমাদের বহু বিজয় কেন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে? অবশ্যই এর অন্যতম প্রধান প্রধান কারণ হিসেবে সঠিক পথ নির্ণয়ে নেতৃত্বের ব্যর্থতা, বহু ভুল-ভ্রান্তি, পদস্খলন ও আদর্শচ্যুতি, নেতাকর্মীদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের আগ্রাসন ইত্যাদিকে

চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ চায় এ অবস্থার পরিবর্তন। তারা চায় শোষণ–বঞ্চনা অন্যায়– অবিচার, অভাব অনটন থেকে মুক্তি, চায় সুখীসমৃদ্ধ সমাজ ও নিরাপদ জীবন। আজ যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারের কথা বলেন তাঁদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে এই চেতনার চারটি মৌলনীতিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও দেশের চাহিদা পূরণ হতে পারে। অতএব এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অব্যাহত লড়াই–সংগ্রামকে সার্থক ও সংহত করার জন্য একদিকে যেমন চাই সঠিক পথ নির্ণয়ের প্রজ্ঞা, তেমনি চাই নিঃস্বার্থ, আদর্শনিষ্ঠ, আত্মনিবেদিত– দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী খাঁটি সমাজতন্ত্রী, যাঁরা জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন এবং জনগণের আস্থাভাজন হবেন।

আগামী দিনের এই প্রয়োজন বোধ থেকেই অতীতের কয়েকজন সংগ্রামী মানুষের স্মৃতিচারণ করেছি এই সঙ্কলনে। এঁদের জীবন, চরিত্র ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষাগ্রহণের বহু উপাদান রয়েছে। অবশ্য কারো পূর্ণ জীবনী লেখার প্রয়াস আমি পাইনি, সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাও আমার ছিলনা, কেবলমাত্র তাঁদের জীবনের সামান্য কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যই লেখাগুলোতে প্রাধান্য দিয়েছি। অবশ্যই এ লেখাগুলোর সাথে জড়িত রয়েছে আমার ব্যক্তিগত আবেগ। তবে শুধুমাত্র এই ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশের জন্য এই সঙ্কলনের কোন প্রয়োজন ছিলনা। যে উদ্দেশ্য থেকে এটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি সেই উদ্দেশ্য সফল বলে মনে করব যদি এই সব সংগ্রামী মানুষের কাহিনী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠকদের ,বিশেষভাবে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ–তরুণীদের কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করতে পারে।

হেনা দাস

শ্রদ্ধেয়া মাসীমা জোবেদা খাতুন চৌধুরী

ত্রিশের দশক চলছে, আমি তখন সিলেটে সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। দেশ জুড়ে তখন বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলেছে। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের অনুগামী মহিলাদের সংগঠিত করা হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেসেরই একটি অঙ্গ সংগঠনে, যার নাম ছিল 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ'। যখন আমি একেবারে নীচের ক্লাশে পড়ি তখন দূর থেকে দেখতাম দলে দলে মহিলারা হাতে তেরঙা জাতীয় পতাকা নিয়ে রাজপথে মিছিল করে যাচ্ছেন, স্বাধীনতার দাবিতে শ্লোগান দিচ্ছেন, পুলিশের আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন এবং গ্রেফতার বরণ করছেন। মহিলাদের বিশাল বিশাল সভা-সমাবেশ-সম্মেলনও চেয়ে চেয়ে দেখতাম এবং মহিলা নেত্রীবৃন্দের অনলবর্ষী বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ধীরে ধীরে কখন যে ঐ আন্দোলনের জোয়ার আমার মনকে আলোড়িত করেছে এবং আমিও ঐ সব সভা মিছিলের অংশীদার হয়ে গেছি তা আজ আর সঠিকভাবে মনে করতে পারিনা। পরিচিত হলাম সিলেটের মহিলা নেত্রীদের সাথে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে মিশেছি তাঁদের সাথে। মনে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তাঁদের সাথে মিশতে গিয়েই আবিষ্কার করলাম এক অনন্যসাধারণ মহিলাকে, যাঁকে প্রথম সম্বোধনেই মাসীমা বলে ডেকেছিলাম। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া সংগ্রামী নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী।

সিলেটের শেখঘাট পাড়ায় ছিল কংগ্রেস মহিলা সংঘের আশ্রম এবং দপ্তর। সেই আশ্রমের সাথে যোগাযোগ হ'ল এবং দিনে দিনে যাতায়াতও বাড়তে লাগল। দেখলাম মহিলা নেত্রীবৃন্দের অধিকাংশই সংসার ত্যাগী হিন্দু বিধবা। এরা সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আশ্রমেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। মূলনেত্রী সরলা দেবের সাথে সার্বক্ষণিক কাজে জড়িত ছিলেন সুপ্রভা পুরকায়স্থ, নরেশনন্দিনী দত্ত, শশীপ্রভা দেব প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। এই সব গৃহত্যাগী ও আশ্রমবাসী মহিলা নেত্রীবৃন্দের এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাঁদেরকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে দেখেছি তাঁদের মধ্যে জোবেদা মাসীমা ছিলেন অন্যতম। তিনি সে যুগে আসলেই একজন ব্যতিক্রমধর্মী মহিলা নেত্রী ছিলেন। অন্যদের মত তিনি সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন

করেননি। স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে তার ছিল বিরাট সংসার। সংসার ধর্ম পালন করেই তিনি বাইরের জগতে পদচারণা করতেন। সবচাইতে বড় কথা হল, তিনিই ছিলেন সিলেটের একমাত্র মুসলিম মহিলা নেত্রী। সে যুগে এটা ছিল একটা বিরল ঘটনা। মুসলিম মেয়েরা তখন ছিল কঠোর পর্দাপ্রথার নিগড়ে বন্দী। মেয়েরা কিছুটা বড় হলে বাড়ীতে আত্মীয় পুরুষদের সামনেও বের হতে পারতনা, বাইরে বের হওয়ার কথা তো কল্পনাই করা যেতোনা। স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখাও অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে ছিল নিষিদ্ধ। আমাদের স্কুলে দেখেছি হাতে গোনা মুসলিম ছাত্রী পড়ছে, সারা স্কুলে মোট ৩০০/৩৫০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ এর বেশী ছিলনা। তাও তাদেরকে আসতে হ'ত গাড়িতে বোরখা পরে অথবা ফুলহাতা জামা গায়ে মাথায় ঘোমটা টেনে। এই যখন অবস্থা তখন শুধু বাইরে বের হওয়া বা স্কুলে লেখাপড়ার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণার চাইতেও কঠিন কাজ ছিল একজন মুসলিম মহিলার পক্ষে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মহিলা সমাজের নেত্রীত্ব গ্রহণ করা। অথচ এই অকল্পনীয় ঘটনাটিই ঘটাতে পেরেছিলেন জোবেদা মাসীমা। সংকল্পের দৃঢ়তা তাঁকে যুগিয়েছিল দুরন্ত সাহস ও অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা। তাঁকে কখনও বোরখা পরতে বা ফুলহাতা ব্লাউস গায়ে দিতেও দেখিনি। সাদা শাড়ী ও সাদা হাফ হাতা ব্লাউস পরে মাথায় ঘোমটা টেনে তিনি যে সভা-মিছিলে, বস্তিতে, পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর সেই রূপটিই এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে ও আচরণে ফুটে উঠত শালীনতা ও সুরুচির ছাপ। কথাবার্তা ছিল খুবই মার্জিত ও ভদ্র। স্বভাবে ছিলেন তিনি অতি বিনয়ী, নম্র ও নিরহঙ্কার। মানবতাবোধ ও গভীর দেশপ্রেম ছিল তাঁর চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য। নির্যাতিত মেহনতী মানুষ বিশেষভাবে অবহেলিত ও নিষ্পেষিত নারী সমাজের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমত্ব বোধ। ইংরেজের দাসত্ব থেকে দেশবাসীর মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সেই সাথে নারী সমাজের মুক্তির স্বপ্ন ও আকাঙ্খা ছিল তার কর্মজীবনের অন্যতম প্রেরণা।

মাসীমার মুখেই শুনেছি বাড়ীর গন্ডির বাইরে বেরিয়ে রাজপথে ও মাঠে-ময়দানে স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের প্রথম কাতারে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁকে আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের কত বিরূপ সমালোচনা ও বাধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু সব বাধাকেই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছিল বাধাকে জয় করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল যা দিয়ে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রভাবিত করতে পারতেন এবং তাঁদেরকে তাঁর সমর্থনে টেনে আনতে পারতেন। গুণটি হল অত্যন্ত নমনীয়ভাবে ধৈর্যের সাথে যুক্তি উপস্থাপন ও অন্যের বক্তব্য খন্ডন করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর নম্র আচরণ, ভাষার মাধুর্য, যুক্তির ধার আত্মীয়স্বজন অনেকেরই বিরুদ্ধতা কাটিয়ে তাঁর কাজের প্রতি নীরব সমর্থন আদায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি তাঁর নিজ গুণেই প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। মাসীমার স্বামী ছিলেন সরকারী

চাকুরে। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি পি,পি-র দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও শান্ত প্রকৃতির। মাসীমার কোন কাজে তাঁকে কখনও বাধা দিতে বা হস্তক্ষেপ করতে দেখিনি। তাঁর পরোক্ষ সহযোগিতা যে মাসীমার চলার পথকে অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাতৃসমা যে মহিলাটিকে দূর থেকে প্রথম দেখেই পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছিল সেই মানুষটির সাথে আমরা একসময় গড়ে উঠল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কখন যে কংগ্রেস মহিলা সংঘের সীমানা ছাড়িয়ে মাসীমার বাড়ীতে আনাগোনা শুরু করেছি তা আজ আর স্পষ্ট মনে পড়েনা। অবশ্য তাঁর সাথে যোগসূত্র স্থাপনের একটি সুযোগ স্কুল জীবনেই হয়েছিল। তাঁর দুই মেয়ে সারা ও মিনা আমাদের স্কুলেই পড়ত। যতদূর মনে পড়ে সারা আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিল এবং মিনা বোধ করি এক ক্লাশ নীচে পড়ত। দু'টি বোনই ভারি মিশুকে ছিল। জোবেদা মাসীমার রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যতিক্রমধর্মী বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই কিন্তু সারা ও মিনার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং এই যোগসূত্র ধরেই মাসীমার বাড়িতে প্রথম আমাদের যাওয়া-আসা শুরু হ'ল। তবে সারা মিনার সঙ্গে গল্প গুজব করার জন্য ও বাড়ীতে যেতামনা, যেতাম মাসীমার আকর্ষণে ও কাজের প্রয়োজনে তাঁরই সাথে আলাপ করার জন্যে।

১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে যখন প্রাচ্যে জাপানী ফ্যাসিস্ট শক্তির পররাজ্য আক্রমণ ও বিজয়াভিযান অব্যাহত গতিতে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং যখন সারা বাংলায় ইংরেজ-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল তখন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে অবিভক্ত বাংলায় গড়ে উঠেছিল একটি নতুন ধরনের মহিলা সংগঠন যার নাম ছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। সিলেট জেলায় ও গোটা সুরমা উপত্যকায় (সিলেট ও কাছাড়) আমরা এই সংগঠনটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলাম। রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল দল, মত, জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মহিলাদের নিয়ে একটি স্বাধীন দলনিরপেক্ষ গণসংগঠন গড়ে তোলাই ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। কিন্তু সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিয়ে প্রথমেই আমরা একটি বড় বাধার সম্মুখীন হলাম। প্রথমত, আমরা যারা উদ্যোক্তা ছিলাম তারা সবাই চিহ্নিত কমিউনিস্ট ছিলাম। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল কমিউনিস্টরা একত্রে কাজ করলেও কংগ্রেসীরা কখনই কমিউনিস্টদের সুনজরে দেখতেননা। বিশেষ করে ১৯৪২-এ কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কংগ্রেসী মহিলাদের "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি"তে টেনে আনা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়ত, আমরা উদ্যোক্তারা প্রায় সবাই ছিলাম কলেজে পড়ুয়া অল্প বয়স্ক ছাত্রী যাদের পক্ষে বয়স্ক মহিলা ও ঘরের গৃহিণীদের আকৃষ্ট করা খুব সহজ কাজ ছিলনা। এ অবস্থায় আমরা খুঁজছিলাম এক বা একাধিক বয়স্ক নেত্রী। তাছাড়া

আমরা চাইছিলাম কংগ্রেসী মহিলা নেত্রীরা এই নতুন সংগঠনের সাথে যুক্ত হউন এবং সাধারণ মহিলাদের সামনে সংগঠনটির সর্বদলীয় চরিত্র ফুটে উঠুক। সিলেট শহরের বাইরে অন্যান্য মহকুমা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে অনেক বয়স্ক ও স্থানীয় কংগ্রেস নেত্রীকে আমরা পেয়েছিলাম সংগঠনের জন্মলগ্নেই, কিন্তু গোটা জেলার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন এমন একজন সুপরিচিত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মহিলা নেত্রীকে খুঁজে বার করতে আমাদের সময় লেগেছে। কারণ প্রথমেই আমরা সঠিক জায়গাটি চিনতে ভুল করেছিলাম। প্রথম কাতারের সব কংগ্রেস নেত্রীর কাছেই গেলাম। কিন্তু একে একে সবাই ফিরিয়ে দিলেন। তাঁদের কথা হ'ল প্রথমত কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্রে তাঁরা কোন সংগঠনে কাজ করবেননা। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস মহিলা সংঘের বাইরে অন্য কোন মহিলা সংগঠন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেননা। তারা সবাই আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেও জোবেদা মাসীমা আমাদের প্রত্যাখ্যান করবেন না এমন একটা বিশ্বাস আগে থেকেই মনে স্থির হয়ে ছিল, কিন্তু তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুটা সংশয়ও জেগেছিল। হাজার হোক তিনিও তো কংগ্রেস দলভুক্ত। তিনি যদি একই যুক্তি দেখিয়ে আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন! যাই হোক আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে যখন আমরা চার-পাঁচজন অল্প বয়সী মেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তাঁকে নেতৃত্বের পদ গ্রহণের আবেদন জানালাম, তখন তিনি এক কথাতেই তাঁর সম্মতি প্রকাশ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন,"এ ধরনের নারী-সংগঠন গড়ে তোলা খুবই জরুরী। তোমরা এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছ দেখে আমি খুবই খুশি। আমি তোমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করব। নেতা হই বা না হই সব সময় তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে নারীসমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করব।" নতুন মহিলা সংগঠনটি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। সত্যিই তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমধমী কংগ্রেস নেত্রী। কোন দলীয় সংকীর্ণতা তার মধ্যে কখনই দেখা যায়নি। যে কাজে নারী সমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল- সে কাজেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তার কোন এলার্জি ছিল না। বরং আমাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে তিনি প্রায়ই আমাদের প্রশংসা করে বলতেন, "তোমাদের মত খাটি সৎ ও আত্মনিবেদিত কর্মী ও নেতা দেশের মূল্যবান সম্পদ। তোমাদের সাথে কাজ করে আমি বড় তৃপ্ত"। যাই হোক জোবেদা মাসীমার সম্মতি লাভের পর সিলেটের প্রথম জেলা সম্মেলনে আমরা তাঁকে জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী পদে নির্বাচিত করলাম। সেই থেকে দেশ-বিভাগ কাল পর্যন্ত যতদিন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র অস্তিত্ব ছিল ততদিন তিনি ছিলেন এই সংগঠনের মাথার মণি হয়ে। আমার মনে হয় আজকের দিনে গোটা বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও সমাজ প্রগতির আন্দোলনে বেগম সুফিয়া কামাল নেতৃত্বের যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছেন তখনকার সময়ে সিলেট জেলার ক্ষেত্রে জোবেদা খাতুনও সেই একই ভূমিকা পালন করে গেছেন। তবে মাসীমা একজন

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে তাঁর কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র ছিল ভিন্নতর। কংগ্রেসের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস মহিলা সংঘের মঞ্চ থেকে তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মাধ্যমে নারী সমাজের সমস্যার বিরুদ্ধে নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতির জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন।

১৯৪৩-৪৪-এর মধ্যেই সিলেট জেলার সব ক'টি শহর ও বিশাল গ্রাম এলাকায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মজবুত সংগঠন গড়ে উঠল। সময়টা তখন ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ-একদিকে যুদ্ধের দামামা, জাপানী বোমা বর্ষণের আতঙ্ক,শহরে-বন্দরে, রাস্তাঘাটে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যদের ব্যাপক চলাচল, অন্যদিকে ভয়াবহ খাদ্য-সংকট, গ্রাম থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ছিন্নমুল বুভুক্ষু মানুষের শহরে আগমন, হাজার হাজার মানুষের 'ফ্যান দাও', 'ভাত দাও' আর্তনাদে শহরের আকাশ বাতাস মুখরিত, রাস্তায় রাস্তায় অনাহারী শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত লাশ, ছিন্নমূল যুবতী মেয়েদের প্রতি বিদেশী সৈন্য, দেশীয় ঠিকাদার, চোরাকারবারী মুনাফাখোর প্রভৃতি মানুষরূপী দানবদের লোলুপ দৃষ্টি, ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তির আশায় দলে দলে অসহায় যুবতীদের দেহ বিক্রি এই ছিল সংক্ষেপে তখনকার পরিস্থিতি। যুদ্ধকালীন এই দুর্ভিক্ষে সারা বাংলায় ৫০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল, যে দুর্ভিক্ষ বাংলা সন অনুযায়ী 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে খ্যাত। সিলেট জেলাও এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। স্বাভাবিক কারণেই এই পরিস্থিতিতে নবজাত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'কে বহুমুখী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের আত্মরক্ষা ট্রেনিং, স্বেচ্ছাসেবিকা ট্রেনিং, লঙ্গরখানায় স্বেচ্ছাশ্রম, দুধ বিতরণ-কেন্দ্র পরিচালনা- রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণ, কুটির শিল্প-কেন্দ্র, তাঁত-কেন্দ্র পরিচালনা, বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কাজের পাশাপাশি চলছিল প্রচারমূলক কাজ ও আন্দোলন, ফ্যাসী-বিরোধী প্রচার, খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন, নারী-সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সভা-সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি। জোবেদা মাসীমা এ সময়ে যে কেবল আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী হয়ে বসেছিলেন তা নয়। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন নেত্রী তেমনি হয়ে উঠেছিলেন তৃণমুল পর্যায়ের কর্মী। তিনি ছুটে বেড়াতেন এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়, এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে, শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, কুয়ারপাড় বস্তি ছিল তাঁর বাড়ির কাছাকাছি এলাকায়। সেখানে শিশুদের দুধ বিতরণ কেন্দ্রে তিনি প্রতিদিন নিজে উপস্থিত থেকে বিতরণ কাজে অংশ গ্রহণ করতেন এবং অন্য মেয়েদের কাজে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। দুঃস্থ মেয়েদের সাথে তিনি প্রাণখুলে কথা বলতেন, তাদের দুঃখ কষ্ট সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং কিভাবে ওদের দুঃখ লাঘব করা যায় সেই চিন্তায় নিজে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতেন, কিন্তু বাইরে তাঁদের সামনে তার অস্থিরতা প্রকাশ না করে তিনি তাদের সাহস দিতেন, সংগঠিত হওয়ার উপদেশ দিতেন। মাসীমা একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় তিনি মুসলিম অধ্যুষিত বস্তি এলাকাসহ বেশ

কয়েকটি পাড়ায় স্থানীয় কমিটি গড়ে তুলেছিলেন এবং কিছু মুসলিম মেয়ে কর্মীও তৈরি করেছিলেন। মূলত মাসীমার মাধ্যমেই শহরের অনগ্রসর বস্তি এলাকার মুসলিম মেয়েদের সাথে ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবন্দী মুসলিম নারী সমাজের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীসমাজের অনগ্রসরতা ও পারিবারিক-সামাজিক দাসত্ব শৃঙ্খলের গভীরতা ও কঠোরতার সাথে কিছুটা হলেও আমরা পরিচিত ছিলাম, কিন্তু মুসলিম নারীসমাজের অবস্থা যে আরও কত ভয়াবহ ও করুণ ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিলনা। জোবেদা মাসীমাই আমাদের হাত ধরে অন্ধকার অন্তঃপুরের অবরোধবাসিনীদের কাছে নিয়ে গেছেন, তাদের মর্মব্যথা ও শৃঙ্খলিত জীবনের সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। একটি বন্ধ দ্বারের অর্গল তিনি খুলে দিয়েছিলেন আমাদের সামনে। নারী সমাজের অবস্থার সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য যে অভিজ্ঞতা আমাদের প্রয়োজন ছিল সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে জোবেদা মাসীমাই আমাদের সর্বপ্রথম সাহায্য করেছিলেন অন্তঃপুরে বন্দী মুসলিম নারীদের জীবনের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটিয়ে।

মাসীমা চেয়েছিলেন মুসলিম মেয়েদের মাঝে একটি জাগরণ সৃষ্টি করতে, তাদের অন্ধকার জীবন থেকে মুক্তির পথকে চেতনার আলোয় আলোকিত করতে। তাই তিনি যেতেন মুসলিম বস্তিতে, পাড়া-মহল্লায় অবরোধবাসিনীদের ঘরে ঘরে। আমরা যেতাম তাঁর সঙ্গী হয়ে। বস্তিতে একদিক থেকে কাজটা সহজতর ছিল। মেয়েদেরকে বস্তির উঠোনে একত্রে জড়ো করা যেত, বৈঠক করা যেত, কারণ অবরোধের বাঁধনটা বাস্তব কারণেই বস্তি এলাকায় ছিল অনেকটা শিথিল। বৈঠকে মাসীমা বক্তব্য রাখতেন অত্যন্ত সহজ ঝরঝরে আঞ্চলিক ভাষায়। বৈঠকী বক্তৃতায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। বক্তৃতাকালে তাঁর গলার স্বর থাকত সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর মিষ্টি কন্ঠস্বর, স্পষ্ট উচ্চারণ ও চমৎকার বাচনভঙ্গি শ্রোতাদের আকৃষ্ট না করে পারতনা। তবে বস্তির মেয়েদের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অদৃষ্টবাদিতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনার কারণে তাদের সংগঠিত করতে বেগ পেতে হয়েছে যথেষ্ট। তবে মাসীমা ধৈর্য ও কৌশলের সাথে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এসব বস্তিতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কমিটি গঠনেও শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন। যে কাজটিতে মাসীমা সবচাইতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের গৃহবন্দী নারীদের কাছে জাগরণের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ। এরা সব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন একটি বৃহৎ কারাগারের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলে আবদ্ধ নিঃসঙ্গ বন্দীর দল। এদেরকে একত্র করার উপায় নেই, কোন বৈঠক বা সভায় উপস্থিত হওয়ার স্বাধীনতা এদের নেই, এমনকি সে বৈঠক যদি কারো বাড়ির কোন কক্ষে কেবলমাত্র মহিলাদের উপস্থিতিতে হয়, তবু সেখানেও হাজির হওয়ার স্বাধীনতা নেই-পারিবারিক ও সামাজিক আইন ভাঙ্গার ক্ষমতা ও সাহস কোনটাই তাদের তখনও জন্মায়নি। এ অবস্থায় প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প

ছিলনা। বিভিন্ন পাড়ায় কিছু বাড়ি বেছে নিয়ে মাসীমা এই কঠিন কাজটি শুরু করলেন। ঘরে ঘরে যোগাযোগের এই ব্যবস্থা একটি নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থায় পরিনতি হয়েছিল। আমরা পালা করে তাঁর সাথে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়েছি। দেখেছি কি অসীম ধৈর্য নিয়ে দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা ও বইপত্রের মাধ্যমে তিনি মেয়েদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশাময় জীবনে আশার আলো জ্বেলে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। এটা সত্য যে তার নিরলস প্রচেষ্টা সত্বেও এই সব মেয়ের সবাইকে ঘরের চার দেয়াল থেকে মুক্ত করে সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু চেতনার অগ্নিস্পর্শে তিনি তাঁদের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করতে পেরেছিলেন, তাদের মনে জাগাতে পেরেছিলেন নারীমুক্তির তীব্র আকাঙ্খা, প্রত্যয় ও স্বপ্ন, যা কিনা পরবর্তী সময়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় বারুদের স্তূপের মত জমাট বেঁধে উঠেছিল।

আজকাল যেমন নির্যাতিত অসহায় নারীদের সহায়তা দানের জন্য 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' সহ বিভিন্ন সংগঠনের জেলা পর্যায় পর্যন্ত দক্ষ আইন-সহায়তা-কেন্দ্র আছে তখনকার দিনে এমন কোন সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। কিন্তু যুগে যুগে নির্যাতিত মেয়েরা বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়, না পেলে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায়। সিলেটের তৎকালীন নির্যাতিত নারী-সমাজের জন্যে জোবেদা মাসীমা এমনি এক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস নেত্রী ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী হিসেবে গোটা জেলায় মাসীমার সুখ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এসব পরিচয় ও সুখ্যাতির উর্ধ্বে তার মধ্যেও যে চুম্বকীয় সম্পদের সন্ধান পেয়েছিল নির্যাতিত মেয়েরা তা হচ্ছে তাঁর চমৎকার সংবেদনশীল মন ও সহানুভূতিশীল আচরণ। তাই তারা বিপদ আপদে ছুটে যেত তাঁর কাছে। তারা বিশ্বাস করত যে এই মহিয়সী মহিলার কাছে গেলে কোন না কোন একটা উপায় হবেই। গরীব মুসলিম পরিবারে অকারণে বউ তালাকের ঘটনা ঘটত খুব বেশী। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বউদের উপর দৈহিক মানসিক অত্যাচার ও মারপিটের ঘটনা তো খুবই সাধারণ, তা আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু যতক্ষণ মেয়েরা আশ্রয়টুকু না হারায় ততক্ষণ হয় মুখ বুঁজে সব সহ্য করে না হয় আত্মহত্যা করে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। এ ধরনের নির্যাতিত মেয়েরা খুব কমই আসত মাসীমার কাছে। যারা বেশী সংখ্যায় আসত তারা ছিল আশ্রয়চ্যুত, তালাকপ্রাপ্ত অথবা পরিবার থেকে বিতাড়িত, শারীরিকভাবে নির্যাতিত মেয়েরা, এদের কেউ বা শিশু সন্তানসহ আশ্রয়চ্যুত, কেউ বা একা। মাসীমার কাছে যখনই এ ধরনের বিপন্ন কোন মেয়ে আসত তখনই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। জরুরী খবর দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠাতেন। কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। দেখতাম কি অসীম মমতায় আবেগাপ্লুত হয়ে মনোযোগ সহকারে মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনছেন, তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন, আবার লড়াই করার সাহস সঞ্চয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছেন। মনে হত মেয়েটির দুঃখ যন্ত্রণার সাথে তিনি যেন একাত্ম হয়ে গেছেন, ঐ যন্ত্রণা যেনো

তারই যন্ত্রণা। অন্যের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল মাসীমার। উপলব্ধির পাশাপাশি তাঁর চিন্তা জাগত কি করা যায় এই মুহূর্তে! প্রথমেই তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন একটি সাময়িক আশ্রয়মূলের, তারপর অন্যান্য পদক্ষেপের সুচিন্তিত পরিকল্পনা। মাসীমা নিজেই ছুটোছুটি করতেন। কোথায় কার বাড়িতে মেয়েটিকে আপাতত আশ্রয় দেওয়া যায় তা খুঁজে বার করতেন নিজেই। মেয়েটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তারপর শুরু করতেন পরবর্তী কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা পারতেন না। এই ব্যর্থতার গ্লানিতে তিনি গভীর যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তিনি প্রশ্ন করতেন এসব হতভাগ্য মেয়েদের স্বাবলম্বী করার ও আইন সহায়তা দেওয়ার কথা কে ভাববে? বিদেশী শোষক ইংরেজ সরকারের কাছে তো তা আশাই করা যায় না। তাহলে? পুরুষ-শাসিত সমাজ ভাববে কি? না কি শুধু সচেতন নারীসমাজকেই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে? এ সব প্রশ্ন নিয়ে তিনি যেমন মহিলানেত্রী ও কর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন তেমনি পুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথেও আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করতেন।

মাসীমার সাথে আমরা রাজনৈতিক বিতর্কে যেতে চাইতাম না, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু তাঁর ঘরেই বিতর্কের বীজ অঙ্কুরিত হ'ল। মাসীমার ছেলে মোয়াজ্জেম ছাত্রাবস্থাতেই বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ল, কিন্তু কংগ্রেস বা তার অঙ্গ-সংগঠন ছাত্র কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে সে যোগ 'দিল নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র সিলেট জেলা শাখায় এবং ক্রমে সে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করল। মোয়াজ্জেমই প্রথম মায়ের সাথে রাজনৈতিক বিতর্ক উথাপন করেছিল। মাঝে মাঝে মাসীমার বাড়িতে এ ধরনের বিতর্ক হত এবং মোয়াজ্জেমকে পাশে পেয়ে আমরাও মাসীমার সাথে তর্ক জুড়তে সাহসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাসীমাকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি, সবসময় তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ প্রসন্নতা নিয়ে ধীর স্থির শান্ত কণ্ঠে যুক্তি খন্ডন করার চেষ্টা করতেন। এসব আলোচনায় কখনও তিক্ততার ছায়া দেখতে পাইনি। বরং আলোচনার ইতি ঘটত চমৎকার সুস্থ পরিবেশে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে। এ যেন মা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক কথা কাটাকাটি, যা মাসীমাকে আনন্দই যোগাত।

মাসীমা যে কখন কংগ্রেসের রাজনীতি ছেড়ে মুসলিগ লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠছিলেন তা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি, তিনি বুঝতেও দেননি। কিন্তু বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলাম সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠানের সময়। তৎকালীন পূর্ব-বাংলার এই জেলার অধিবাসীদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ভোটের মাধ্যমে তাদের মত প্রকাশের- তারা পাকিস্তানে থাকবে না ভারতে যোগ দেবে এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের। আমাদের দলীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কাজ করছিলাম ভারতে

যোগদানের পক্ষে। মাসীমা কাজ করছিলেন পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার পক্ষে। উভয় পক্ষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় এবং ব্যস্ত। মাসীমার সাথে এ সময়টা দেখা সাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ ছিল। তখন মাঝে মাঝেই মনে হত মাসীমার সাথে যেন আমাদের অজান্তেই একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই দূরত্বটা কতখানি এবং কেন তা অনুধাবন করতে পারলাম ভোট গ্রহণের দিনে মহিলাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে। মাসীমার সাথে দেখা হ'ল ঐ সব ভোট কেন্দ্রে। তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তাঁর পাশে রয়েছেন বহু মহিলা কর্মী, তাঁদের মধ্যে আমার বন্ধু–স্থানীয় কয়েকজনকেও দেখলাম যাদেরকে এর আগে কখনও রাজনৈতিক অঙ্গনে বা সমাজ–সেবার কাজে দেখা যায়নি। ভোট গ্রহণ উপলক্ষে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা আগে থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে তারই উত্তাপ অনুভব করতে লাগলাম। মাসীমা আমাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমরা যে তার সাথে কথা বলব এমন পরিবেশও ছিলনা। উপস্থিত মহিলা–কর্মীরা এতই উত্তেজিত ছিল যে আমার বান্ধবী পর্যন্ত আমাদের গালিগালাজ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ওদের ভাবটা ছিল এরকম– যেন আমরা পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মহা অন্যায় করেছি। যাই হোক ওদের আচরণে মোটেই বিচলিত হইনি, কিন্তু বিচলিত হয়েছি মাসীমার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায়। অন্য দিকে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করলাম মুসলিম মহিলাদের মহাজাগরণের অভূতপূর্ব দৃশ্য। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অন্তঃপুরবাসিনী মুসলিম মহিলারা আসছেন ভোট কেন্দ্রে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে। কত যুগ পরে পরিবার ও সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে এসেছেন চিরমুক্তির আশায়। ভোট কেন্দ্রগুলো যেন উপচে পড়ছে তাদের ভিড়ে। সিলেট শহরে যে এত মুসলিম মহিলা বাস করেন তাই তো এতকাল জানা ছিল না। কোথায় তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন এতকাল। সমাজের কোন্ পাতালপুরীতে তাঁদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এর আগেও তো সিলেটে নানা ধরনের ভোট হয়েছে, কিন্তু কখনও তো এমন দৃশ্য দেখিনি। ভাবছিলাম মাসীমা রাতারাতি এত মহিলা কর্মীই বা সংগ্রহ করলেন কি ভাবে? কোন্ যাদুতে এই অভাবনীয় মহাজাগরণ সম্ভব হল ? এই জাগরণে নেতৃত্ব দিতে মাসীমা কেন এগিয়ে গেলেন ? এসব প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছি নিজের কাছেই। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মতই মাসীমাও স্বপ্ন দেখেছিলেন পাকিস্তানে পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায় উন্নতির সুযোগ পাবে, তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিপীড়িত নারী সমাজও পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে পারবে। এই স্বপ্ন, এই আশাই সঞ্চারিত হয়েছিল সিলেটের মুসলিম নারীসমাজের মাঝে এবং তাদের এই জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাসীমা। এই জাগরণেরই আর এক বিস্ময়কর রূপ দেখেছিলাম গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হওয়ার পর মহিলাদের বিশাল বিজয় মিছিলে। এ ছিল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। শহরের রাজপথে দলে দলে ছোট বড় সব বয়সের মুসলিম মহিলারা মিছিল করে যাচ্ছেন, এমন

ঘটনা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের মিছিলের পুরোভাগে যে মাসীমা ছিলেন মুসলিম মহিলাদের একমাত্র প্রতিনিধি, সেই মাসীমা নেতৃত্ব দিচ্ছেন অসংখ্য মুসলিম মহিলার বিজয় মিছিলে। তাঁর জন্য সেদিনটি নিশ্চয়ই ছিল আনন্দের, সাফল্যের ও তৃপ্তির। কিন্তু কি হয়েছে তারপর সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। আশাহত হয়েছেন সবাই। মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। শোষণ-নিপীড়ণ বেড়েছে বই কমেনি। নারীসমাজের মুক্তি আসেনি। নারী নির্যাতন বন্ধ হওয়া দূরের কথা আরও তীব্রই হয়েছে। এদিকে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে মাসীমার সাথে আমার যোগাযোগ দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সরকারের দমননীতি আমাদের বাধ্য করল আত্মগোপনে চলে যেতে। আত্মগোপন অবস্থায় সিলেট জেলাতে দশ বছর কাটালেও মাসীমার সাথে যোগাযোগ হয়েছে মাত্র ২/৩ বার, তাও পরোক্ষ উপায়ে অন্যের মাধ্যমে। তারপর চলে এলাম ঢাকায় শিক্ষকতা পেশা নিয়ে। মাসীমার সাথে গোটা পাকিস্তানী আমলে আর কোন সম্পর্কই থাকলনা। তিনি কি ভাবতেন, কি করতেন কিছুই জানার সুযোগ হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২/১ বছর পরই মাসীমার দেখা পেলাম আর এক বিশাল নারীমুক্তির মিছিলে। সালটা মনে নেই। ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'- এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে উদ্বোধনী অধিবেশনের পরই বেরিয়েছিল উপস্থিত মহিলাদের এক বিশাল মিছিল। আমিও সেই মিছিলে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সামনের দিকে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার কয়েক সারি সামনেই অবিকল জোবেদা মাসীমার মত এক মহিলা হেঁটে যাচ্ছেন মিছিলের সাথে শরিক হয়ে। ভুল হওয়ার কথা নয়। দৌড়ে গিয়ে তাঁর নাগাল পেলাম। তিনি আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আবেগে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে সেই চির পরিচিত হাসি, চোখে আনন্দের ঝিলিক। ২৪/২৫ বছর পর দেখা। মাসীমা তখন রীতিমত বৃদ্ধ। কিন্তু আমার মনে হ'ল মাসীমা এতটুকু বদ্‌লাননি। নারীমুক্তির লক্ষ্যে তিনি এখনও অবিচল। তাঁর অন্তর জুড়ে জেগে আছে নারীজাতির মুক্তির স্বপ্ন। তাই তো বৃদ্ধ বয়সেও তারুণ্যের উদ্যম ও মনোবল নিয়ে মিছিলে শামিল হয়েছেন। মিছিলে চলতে চলতেই তাঁর সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল। তিনিই বললেন, "দেখো কত বছর পর আমরা আবার এক মিছিলে এসে মিশে গেলাম। কি যে ভাল লাগছে। নিশ্চয়ই এবার স্বাধীন বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন আসবে।" আমি লক্ষ্য করলাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাঁর প্রত্যাশা ও প্রত্যয় কত গভীর। তিনি আরও জানালেন মহিলা পরিষদের লক্ষ্য আদর্শ ও কাজ তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে এবং তিনি এই সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকবেন। তিনি বললেন, "মহিলা পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে এত মহিলার জমায়েত দেখে আমি সত্যিই অভিভূত। আর নারী মুক্তির একই প্রত্যাশা-তলে তোমার সাথে মিলতে পেরে আরও আনন্দিত।" গণভোটের সময় মাসীমার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সামান্য চিড় ধরেছিল তার একটা গভীর বেদনা মনের মাঝে স্থায়ীভাবে বাসা

বেঁধেছিল। সেদিন মিছিলে তাঁর দেখা পেয়ে ও তাঁর সাথে কথা বলে মনে হ'ল আমি যেন সেই বেদনার ভার থেকে মুক্ত হলাম। গোটা পাকিস্তানী আমল পার করে যাঁর সাথে আমার নতুন করে দেখা হ'ল তাঁর সাথে সেই দেখাই যে হবে শেষ দেখা তা তখন ভাবতে পারিনি।

মাসীমা বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে আছে তাঁর আদর্শ, তাঁর স্বপ্ন। একদিন একাকী এক দুঃসাহসী মহিলা সিলেটের নারী সমাজের সামনে যে আলোর প্রদীপ জ্বেলেছিলেন সেই প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়ুক লক্ষ কোটি প্রদীপ হয়ে, মাসীমার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসুক আরও অনেক সাহসী নারী যারা সভ্য সমাজ বিনির্মাণে, নারীমুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, যারা ফতোয়াবাজের দ্বারা আক্রান্ত বৃহত্তর সিলেটের ছাতকছড়া গ্রামের নূরজাহানের মত নিষ্ঠুর অপমৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেবেনা, নারী নির্যাতনের ইতি ঘটাবে চিরতরে– সেই আশা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করে পরম শ্রদ্ধেয়া জোবেদা খাতুন চৌধুরীর প্রতি নিবেদন করছি আমার অসীম শ্রদ্ধা।

প্রবীণ বিপ্লবী সত্যেন্দ্র রায় স্মরণে

২৯শে জুন ভোরবেলা সত্য আমাদের ছেড়ে এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছে। তার এই আকস্মিক মৃত্যুর বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া এবং এই চির বিচ্ছেদের বেদনাকে সহ্য করা যে কত কঠিন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা যায়, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া যায়।

তখন এদেশে বৃটিশ–শাসনের শেষ অধ্যায় চলছে। একটি টগ্‌বগে কিশোর বয়সী ছাত্র, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখেই থেমে থাকেনা, বৃটিশ–বিরোধী স্বাধীনতা–সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্র বয়সেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র–কংগ্রেসের সিলেট জেলা শাখায় সে যোগদান করে। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে কংগ্রেসের আহ্বানে শুরু হল ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, যা আগস্ট আন্দোলন নামে খ্যাত। প্রবল বেগ ও শক্তি নিয়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। সিলেটের সেই কিশোরটিও নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনের এই মহাপ্লাবনে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ঐ আন্দোলনকে সমর্থন করেনি, কারণ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটেন তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র। কাজেই বৃটিশের যুদ্ধ–প্রস্তুতিকে (ভারতের মাটিতে) ক্ষতিগ্রস্ত করার মত কর্মসূচীকে কমিউনিস্টরা সমর্থন করা সমীচীন মনে করেনি। এই মতদ্বৈধতাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসীদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ তীব্র হয়ে ওঠে। এ ছেলেটিও এই বিদ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু ছেলেটির ছিল মুক্ত মন ও জানবার কৌতূহল। সে কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের (যে সংগঠনে কমিউনিস্ট ছাত্ররা কাজ করত) জনসভাগুলোতে গিয়ে বক্তাদের বক্তৃতা শুনত। এমনি শুনতে শুনতে এবং তাদের কাজকর্ম ও নেতাদের আচার–আচরণ লক্ষ্য করতে করতে ছেলেটির চিন্তায় পরিবর্তন এলো। সে ছাত্র কংগ্রেস থেকে প্রথমে ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিল। পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করল। এই সময় থেকেই ছেলেটির সাথে আমার এবং আমার পরিবারের সবার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। ছেলেটির নাম শক্তিপদ ভট্টাচার্য। আমরা শক্তি বলেই ডাকতাম। এই শক্তিপদই একদিন তার রাজনৈতিক আদর্শের

প্রয়োজনে নিজের পৈতৃক নামটিকে উৎসর্গ করে সত্যেন্দ্র রায় নামে পরিচিত হল। আমৃত্যু তার এই পরিচয়ই বহাল থাকল। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা সত্য রায়ের পরিচিতিতেই পরিচিত হল। আমরা সত্যেন্দ্র রায়ের পরিচয়কে সত্য বলে গ্রহণ করলেও ভুলে যেতে পারিনি অতীতের শক্তিপদকে।

সিলেটের নিজরুন্দা গ্রামের এক কট্টর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে শক্তির জন্ম হয়েছিল। আজকের যুগে অচিন্তনীয় নানা ধরনের কঠোর বিধি–নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল এই ব্রাহ্মণ সমাজ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথা বাদই দিলাম, গোটা হিন্দু সমাজ থেকেই এই ব্রাহ্মণ সমাজ নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। নানাবর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজের শীর্ষে ছিল এদের সামাজিক অবস্থান। শক্তিপদর বাবা তাকে তারমত গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিত হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই যুক্তি ও বুদ্ধির উন্মেষের সাথে সাথে শক্তিপদ প্রতিটি কুসংস্কার, কুপ্রথা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এর জন্য বহুবার তাকে তার বাবার কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল। এক সময়ে সে বহু সংগ্রাম করে সিলেট শহরে এসে পড়ার অনুমতি পেয়েছিল। থাকার জায়গা ঠিক হয়েছিল তার বাবার অন্যতম শিষ্য সিলেট তথা আসামের পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানের বিখ্যাত কংগ্রেসী রাজনীতিবিদ এবং একসময়ের মন্ত্রী বসন্ত দাসের বাড়িতে। ব্রাহ্মণের হাতের রান্না ছাড়া অন্য জাতের কারো রান্না খাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একবার বসন্ত দাসের অনুপস্থিতিতে শক্তিপদ তার বাড়িতে কায়স্থ চাকরের রান্না খেয়েছিল। বসন্ত দাস ফিরে এসে এই সংবাদ জানতে পারেন। শক্তিপদকে প্রথম শাস্তিটি তিনিই দিলেন। তিনি তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তার বাড়িতে আর তাকে রাখা সম্ভব হবেনা। তিনি তাকে অভিযুক্ত করে তার বাবাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন এবং তাকে তার গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ি ফিরে শক্তিপদকে তার বাবার রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল; কিন্তু যে ছেলে যুক্তি–বুদ্ধি দিয়ে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে, যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, পরাধীন দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজছে, তাকে কি বেঁধে রাখা যায়? শক্তিপদকে বেঁধে রাখা যায়নি।

শক্তিপদ যখন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিল তখন আমি ও আমার ছোড়দা এই সংগঠনে কাজ করছিলাম। কাজেই প্রথমে আমাদের পরিবারের এই দু'জনের সাথেই শক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরে আমাদের গোটা পরিবারের সাথেই তার সম্পর্ক ঘনিষ্ট ও গভীর হয়ে উঠল। শক্তির বয়সের হিসেব কোনদিন নেওয়ার দরকার মনে করিনি। তখনকার অবস্থানে আপনা আপনিই তার সাথে আমার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল ছোট ভাই দিদির সম্পর্ক। পত্রপত্রিকায় তার মৃত্যুর পর যে খবর বেরিয়েছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছে ওর বয়স হয়েছিল ৭২। এর কোন সঠিক ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয়না। সে অবশ্যই আমার

ছোট ছিল। আমার বয়স যদি এখন আটষট্টি পেরিয়ে উনসত্তরে পড়ে থাকে তাহলে সত্যের বয়স নিশ্চয়ই আটষট্টির সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। যাই হোক্ বয়সটাও বড় কথা নয়, সম্পর্কের বাঁধনটাই বড় কথা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টির জন্য এলো এক কঠিন সময়। পাক্ সরকারের তীব্র দমননীতি, কমিউনিস্টদের ব্যাপক ধরপাকড়, নৃশংস অত্যাচার ও জুলুম পার্টির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড হুমকি হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে সরকার ও সরকারী দল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাতে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ পার্টিকেও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, বহু হিন্দু কমিউনিস্ট দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এ সময়টা ছিল পার্টির প্রতিটি সদস্যের নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় যারা গৌরবের সাথে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে শক্তিপদ। শুধু তাই নয়, পুলিশ ও গোয়েন্দার শ্যেন দৃষ্টির হাত থেকে গোপন পার্টির অস্তিত্ব রক্ষা, গোপন আস্তানা ও নেতাদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং পার্টিকে সচল রাখার লক্ষ্যে গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে টেক্- যন্ত্রটি গড়ে তোলা হয়েছিল, শক্তিপদ ছিল সেই যন্ত্রটির অন্যতম শক্ত খুঁটি। সে ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় টেক্-যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে পার্টির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে পার্টির দেশপ্রেমিক ভূমিকা পালনে এই সব টেক-কর্মী যে অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছে তার কোন তুলনা হয়না। অথচ রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের কোন পরিচিতি ছিলনা, পরিচয় গোপন রাখাটাই ছিল তখন প্রয়োজন। নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লোভ তাদের ছিলনা। ছিলনা নেতৃত্বের মোহ বা ব্যক্তিগত জীবনে ধনদৌলত ও প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা। নীরবে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে ওরা কাজ করে গেছে অসাধারণ ঝুঁকি নিয়ে, উপেক্ষা করেছে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, জেলজুলুম ও মৃত্যুর ভয়কে, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে ওরা উৎসর্গ করেছিল ওদের জীবনকে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শের যূপকাষ্ঠে। প্রকৃত পক্ষে এরা ছিল এদেশের মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের একেক জন বীর সাহসী সৈনিক। শক্তিপদ ছিল এমনি এক নির্ভীক সেনানী, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ত্যাগের মহিমায় যার জীবন ছিল চির উজ্জ্বল। কিন্তু বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী নেতার খ্যাতির আড়ালে হারিয়ে গেছে আজ শক্তিপদর মত ত্যাগী বিপ্লবীর পরিচয়। তার পরিধির বাইরে খুব কম লোকই শক্তিপদকে চেনে। আমি তাই অন্ধকার আকাশের বুক চিরে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে তুলে এনে সবার সাথে তার কিছুটা পরিচয় করাতে চাই। আজকের প্রজন্মকে আলোকিত করতে চাই নিভৃত জগতের এই মানুষটির জীবনের উজ্জ্বল শিখায়।

পঞ্চাশের দশক থেকেই শক্তিপদ ঢাকায় টেক্ কাজের সাথে জড়িত ছিল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডাক, চিঠিপত্র আদান প্রদান, গোপন নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি নানাবিধ কাজের সাথে শক্তি যুক্ত ছিল। এক পর্যায়ে তার পাড়ায় এক বাড়িতে একটি গোপন আস্তানা তৈরি হল। এই বাড়িতে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা আমার দাদা বারীন্দ্র দত্ত, তার স্ত্রী ও তাদের শিশু সন্তান লিলি ও বাবুলের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। এই বাড়ির প্রকৃত অভিভাবক, বারীন্দ্র দত্তকে মাঝে মাঝে অন্যত্র যেতে হত। ফতুল্লার গোপন আস্তানার প্রকাশ্য কভার হওয়ার প্রয়োজনে শক্তিপদের নতুন নাম হ'ল সত্যেন্দ্র রায়। বছরের পর বছল ফতুল্লায় থাকার ফলে পরবর্তীকালে তার পেশাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই নামটাই পাশ হয়ে গেল। আদর্শের প্রয়োজনে শক্তিপদ ভট্টাচার্য নামটি চিরতরে বিসর্জিত হল। পৈতৃক নামের মোহ পরিত্যাগ করা সোজা কথা নয়, বিশেষ করে যে নামে আছে পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু আদর্শের খাতিরে এই মোহ পরিত্যাগ করতে সত্য এতটুকু বিচলিত হয়নি। সে ছিল আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষ আভিজাত্য ও হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী, মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিল সে, অভিজাত সামন্ত শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা শোষিত মানুষের মুক্তির পক্ষে সে ছিল এক নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী সাহসী সৈনিক। তাই হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতি,ধর্ম ও বর্ণের শোষিত মানুষের সত্তার সাথে তার মানবিক সত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কায়স্থের হাতের রান্না খাওয়ার অপরাধে যে একদিন কঠিন শাস্তি ভোগ করেছিল সেই ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে মুসলিম পরিবারে অন্ন গ্রহণ করে এবং একাধারে শওকত আলী ও সত্যের ভূমিকা পালন করে সেই শাস্তির যোগ্য জবাব দিতে পেরেছিল। কুসংস্কার ও গোঁড়ামির অচলায়তন ভাঙ্গার কাজে সত্যের এই বলিষ্ঠ ভূমিকা মূল্যবান অবদান রেখেছিল। কালের প্রবাহে আঘাতে আঘাতে ক্রমেই এই অচলায়তন ধসে পড়েছে। তাই সত্য তার পরিবারের সদস্যদের কাছে ও তার সমাজের কাছে পরিত্যাজ্য হয়নি, বরং সে তাদের কাছে সমাদৃত হয়েছে একজন মহৎ ব্যক্তি ও খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে।

১৯৫৮তে আমি ঢাকা এসে চাকরি নেবার পর ফতুল্লার বাড়িকে কেন্দ্র করে সত্যকে কাছে পেয়েছি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে। প্রায় নিত্যদিন যাতায়াত হ'ত, প্রথমে গেন্ডারিয়া-ফতুল্লা, পরে ফতুল্লা-নারায়ণগঞ্জ। এক পর্যায়ে ফতুল্লার বাড়ির গোপনীয়তা রক্ষার নিয়ম অনেক শিথিল করা হয়েছিল অর্থাৎ আমরা আত্মীয়-স্বজনরা অবাধে ফতুল্লার বাড়িতে যেতাম, কখনও বা থাকতাম। বারীনদত্তের ছোট ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সত্য আমাদের প্রকৃত ছোট ভাইয়ের আসন দখল করে নিয়েছিল। তাকে দেখেছি বাড়ির কর্তা হিসেবে কি চমৎকার আন্তরিকতার সাথে সে এই সংসারের দায়িত্ব পালন করছে। নিরাপত্তার ব্যাপারে চোখকান খোলা রেখে নিত্যদিনের কাজ সে করে যেত। বাজার করা,

হিসেব রাখা, বৌদিকে রান্নাবান্নার কাজে সহায়তা করা লিলি বাবুলকে দেখাশোনা করা , পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়া-আসা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও তাদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করা, ঢাকার গোপনকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে তার ব্যস্ত দিন কাটত। লিলি বাবুলকে ও যেভাবে শাসনে-আদরে মানুষ করেছে তা না দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবেনা। ওরাও ছিল এই কাকুর পরমভক্ত, তাকে ওরা যেমন মান্য করত তেমনি ভয়ও করত। কারণ সে যেমন ছিল অত্যন্ত স্নেহশীল তেমনি শাসনে ছিল কড়া। কে বলবে লিলি বাবুল তার আপন ভাইয়ের সন্তান নয়? আপন লোক ছাড়া এত আদর এত শাসন আর কে করতে পারে। শুধু লিলি বাবুলই নয় আমার মেয়ে সহ সব ঘনিষ্ঠজনদের সন্তানেরা তার অপার স্নেহে ও শাসনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে ভালবেসেছে।

ফতুল্লার বাড়ীতে বাইরের জেলা থেকেও আত্মগোপনকারী নেতারা মাঝে মাঝে নানা প্রয়োজনে এসে থাকতেন। কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতারাও আসা যাওয়া করতেন। এদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সত্য খুবই সতর্ক ছিল। কেউ যাতে কোন রকম সন্দেহ না করতে পারে তার জন্য সে নানা কৌশলে পরিবারের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। তার আর একটি প্রয়াস ছিল পাড়া প্রতিবেশীদের মনজয় করা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তার প্রয়াস সফল হয়েছিল তার চরিত্র গুণেই। সে ঐ এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে এমনভাবে একাত্ম হয়েছিল যে সবাই তাকে গ্রহণ করেছিল অতি আপন জন হিসেবে এবং গোটা পরিবারটির সাথেই তার গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শেষ দিকে প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বিষয়টি আঁচ করলেও তারা সহানুভূতি ও সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবেশীদের এই সমর্থন ও সহানুভূতি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তাদের সাথে সম্পর্কের এই সেতুবন্ধটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল সত্যেরই প্রচেষ্টা ও স্বভাবগুণে।

সত্যকে যে ধরনের কাজ করতে হত সেই কাজের রাজনৈতিক মূল্য অনুধাবন করার কোন সুযোগ সাধারণ মানুষের সামনে ছিলনা। কাজগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একঘেঁয়ে। এ কাজে জনতার করতালি পাওয়া যায়না, পত্রিকায় নাম আসেনা, মিছিলের ছবিতে নিজের প্রতিকৃতি দেখা যায় না, এমনকি নিজের রাজনৈতিক পরিচয়টাও মানুষের কাছে প্রকাশ করা যায় না। তবু নাম-যশের তোয়াক্কা না করে সত্য বছরের পর বছর নেপথ্যে থেকে রাজনৈতিক গুরু দায়িত্ব পালন করে গেছে এবং এতেই সে লাভ করেছে গভীর আত্মতৃপ্তি। আদর্শের জন্য এও ছিল একধরনের আত্মবলিদান। অবশ্য সত্য কেবল মাত্র ঐ দায়িত্ব পালন করে সন্তুষ্ট ছিলনা। সে চাইত আরও কাজ, আরও গতি, দ্রুত বিপ্লব ও দ্রুত মানুষের মুক্তি। এর জন্য এক ধরনের অস্থিরতা ছিল তার মনের মধ্যে।

ব্রাহ্মণ সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেলেও পন্ডিত পরিবারের মূল্যবান ঐতিহ্যকে সে যত্নের সাথে লালন করে আসছিল। সংস্কৃতে তার চমৎকার জ্ঞান ছিল এবং সব ধরণের মন্ত্র পাঠে সে ওস্তাদ ছিল। কোন বিয়ে বা পূজো ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজকালকার পুরোহিতরা মন্ত্রোচ্চারণে ভুল করলে সেই ভুল সংশোধনে এগিয়ে আসতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতনা। এ প্রসঙ্গে ওর নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জেই- আমাদের দাদা পরেশ গুপ্তের বাড়িতে। বিয়ের কুঞ্জে বর কনেকে সামনে রেখে পুরোহিত যখন মন্ত্রপাঠ করতে শুরু করলেন তখন সত্য নীরবতা ভঙ্গ করে চেঁচিয়ে উঠল, আপনার মন্ত্র পাঠে অনেক ভুল হচ্ছে, এই কথা বলে ও নিজেই জোরে জোরে শুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। ওর কান্ড কারখানা দেখে বাচ্চারা এবং আমরা বড়রা সবাই হাসছিলাম। পরে বিয়ের আসর থেকে উঠে এসে ও আমাদের বলল, "মন্ত্র পাঠ করেই যখন বিয়ে হচ্ছে তখন সেই মন্ত্র সঠিক হওয়া চাই। কোন কাজে ভুল বা ফাঁকি সহ্য করা উচিত নয়। পুরোহিতগিরি করে ব্রাহ্মণেরা পয়সা রোজগার করবেন অথচ মন্ত্রের পূর্ণজ্ঞান অর্জন করবেননা সেটা কি করে হয়।" সত্য এমনি এক ব্যক্তি ছিল যে কোন কাজে ফাঁকি বা দায়িত্বহীনতা দেখলে ভয়ানক রেগে যেত। দীর্ঘকাল পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী থাকার পর যখন সত্য চাকরীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করল তখন সেখানেও সে সজাগ দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে তার নীতিবোধে অটল ছিল, কখনও নীতি থেকে তার এতটুকু স্খলন ঘটেনি। তার কাজের গুণে মালিকের কাছেও সে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ষাটের দশকের শেষার্ধে বিশ্ব কমিউন আন্দোলনের ভাঙ্গন, চীন-সোভিয়েট বিরোধ আমাদের দেশের পার্টিতেও ভাঙ্গন ধরাল। চীনা লাইনের সমর্থকরা মূল পার্টি ছেড়ে আলাদা পার্টি গঠন করলেন। এই ভাঙ্গনের প্রক্রিয়ায় সত্য যোগ দিল চীনাপন্থীদের পার্টিতে, আমরা রয়ে গেলাম মূল পার্টিতে অর্থাৎ যে পার্টি জনসমক্ষে মস্কোপন্থী নামে পরিচিত ছিল। এই রাজনৈতিক মতপার্থক্য এমন তিক্ততার পর্যায়ে গিয়েছিল যে বহু দেশে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে একে কেন্দ্র করে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে গেছে, যেন পরস্পর পরস্পরের এক নম্বর শত্রু। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টি হলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের এতটুকু অবনতি হয়নি। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আমরা একে অন্যের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলাম। মনে মনে আমরা উভয় পক্ষই পরস্পরের অতীত অবদানের উচ্চ মূল্যায়ন করতাম। আমরা জানতাম একজায়গায় আমাদের মিল রয়েছে। আমাদের সবার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। ভুল-শুদ্ধ একদিন প্রমাণিত হবেই এবং একদিন না একদিন এক মোহনায় মিলতে আমাদের হবেই। তাই আসা-যাওয়া দেখা সাক্ষাতের কখনও বিরতি ঘটেনি। সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়

ও ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ভুল শুদ্ধ, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে জোর পর্যালোচনা চলছে। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বরফ গলতে শুরু করেছে বেশ আগে থেকেই। নানা ভিন্ন মত সত্ত্বেও সমঝোতা, মতবিনিময় ও সহযোগিতার ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাসের এই পর্বে বহু হতাশা ও জিজ্ঞাসার মুখে সত্যের সাথে আমাদের রাজনৈতিক বাক্যালাপ আবার শুরু হয়েছিল এটা ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখকর এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য একটি ইতিবাচক বিষয়।

পৃথক ধারায় চলে যাওয়ার পর সত্যের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে পরিচয় না ঘটলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার চরিত্রের বিশেষ গুণাবলির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে। তার নীতিবোধ ও কমিউনিস্ট গুণাবলী সম্পর্কে চেতনা ছিল অত্যন্ত গভীর। তাই তার প্রতিদিনের জীবনে ও আচরণে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি। চাকুরি জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও তাকে কখনও বিলাসী জীবন যাপন করতে দেখিনি। দুই হাতে সে অর্থ সাহায্য করেছে তার বিপন্ন সহকর্মীদের। তার এককালের টেক্ সহকর্মী শৈলেশের সাথে ফতুল্লা বাসকালে যে দৃঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছিল পরবর্তী জীবনে শৈলেশের সাথে তার রাজনৈতিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও। নিজ সংসার জীবনে জড়িত হয়ে প্রকৃত বন্ধুর মত আর একটি পরিবারের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানোর মত চারিত্রিক গুণ আজকাল খুবই বিরল। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বিষয়টিও কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। এই রাজনৈতিক উদারতাও অত্যন্ত দুর্লভ। সত্য যে বিপন্ন বন্ধুকে কেবল অর্থ সাহায্য করেছে তাই নয়- বুদ্ধি, পরামর্শ শ্রম ও সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সাহস যুগিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। আমরা যারা তার ঘনিষ্ঠ জন ছিলাম, প্রত্যেকেই দুঃসময়ে তাকে কাছে পেয়েছি। সত্যের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল যা অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। আলাপচারিতায় হাস্যরসাত্মক ভাষা প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতা ছিল তার। ওর ভাষা এবং বলার ভঙ্গিতে বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই প্রাণ খুলে হাসতে পারত, তার কথায় দুঃখ ভারাক্রান্ত মন হাল্কা হয়ে যেত, থমথমে পরিবেশ হয়ে যেত স্বাভাবিক। ওর নিজের সমস্যা-সংকট ও অসুস্থতার সময়েও সে কখনও বিচলিত হয়নি, সব কিছু সহজ ও হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দিতে পারত। আজকাল সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে চারদিকে যখন তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতন এমনকি কমিউনিস্টদের মধ্যেও চারিত্রিক অবক্ষয় সে লক্ষ্য করত, তখন হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করত গভীরভাবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা ছিল তার।

সত্যের দেশপ্রেম যেমন গোটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের জন্য, এদেশের প্রকৃতি আকাশ, বাতাস, মাটির জন্য উৎসারিত হয়েছিল তেমনি এই দেশেরই

উত্তর–পূর্ব কোণের নদী, হাওর ও পাহাড়ে ঘেরা নিজ জন্মভূমি সিলেট জেলার জন্য তার ছিল বিশেষ টান। সেই নিবিড় টানেরই প্রকাশ ঘটেছে তার দুই মেয়ের নামে। সিলেটের দুই প্রিয় নদী সুরমা ও কুশিয়ারার নামানুসারেই তার মেয়েদের নামকরণ হয়েছে সুরমা ও কুশি।

সম্ভবত দুই তিনমাস আগে সত্যের সাথে আমার শেষ দেখা। শৈলেশসহ সে এসেছিল আমার বাড়িতে। সেদিন আসার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তার। কিছু সহকর্মীর অনুরোধে সে তার স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করেছিল। লেখার প্রথমাংশটি আমাকে দেখাতে এবং আমার কাছে কিছু তথ্য জানতে এসেছিল সে। বেশ দীর্ঘ লেখা– মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলাম তাতে রয়েছে তৎকালীন সমাজের কিছু মূল্যবান চিত্র এবং একটি কিশোর ছেলের সংগ্রামের কাহিনী। লেখাটি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। এটি ছেপে বই আকারে প্রকাশের দাবি রাখে। সত্যের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী ও মেয়েদের দেখতে গিয়ে জানতে পারলাম লেখাটি সে শেষ করে যেতে পারেনি। তবু লেখাটি ছাপা প্রয়োজন। আশা করি বইটির উপসংহার টানবেন তার বর্তমান রাজনৈতিক সহকর্মীরা এবং তারাই বইটি ছাপার উদ্যোগ নেবেন। এ বিষয়ে আলাপ হ'ল তার মেয়ের জামাই যীশুর সাথে। যীশুর সাথে আলাপ করে আমি তৃপ্ত হলাম। সেও বইটি ছাপার ব্যাপারে দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবছে এবং আশ্বাস দিয়েছে শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় এ কাজটি সে করবে।

লোক চক্ষুর আড়ালে একটি সুন্দর ফুল ফুটেছিল বিকাশের প্রয়োজনে, বিকশিত হয়েছে– তারপর কালের অমোঘ নিয়মে ঝ'রে গেছে নিঃশব্দে, কিন্তু সৌরভটুকু রেখে গেছে আমাদের জন্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আশাকরি এই সৌরভ ছড়িয়ে বর্তমান ও আগামী দিনের তরুণ প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ্‌রা সত্যের শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের কাজে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসবেন।

৭–৭–৯২

এক কালের রাজনৈতিক সহকর্মী
ডঃ আখলাকুর রহমান

সিলেটের এক অখ্যাত গ্রামের কৃতী সন্তান আখলাকের সাথে আমার প্রথম পরিচয় চল্লিশের দশকের শেষভাগে। আমরা উভয়ই তখন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সিলেট জেলা শাখার কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এদেশের মেহনতী মানুষের শোষণ-মুক্তি ও সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনার লক্ষ্যে আমরা উভয়ই আমাদের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। সেই সূত্রেই আখলাকের সাথে প্রথমে পরিচয়, তারপর ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় আত্মীয়তা। বয়সে আখলাক আমার চাইতে বছর তিনেকের ছোট ছিল। তাই সম্পর্কটা কেবলমাত্র রাজনৈতিক সহকর্মীর পর্যায়ে না থেকে দিদি ও ভাইয়ের সম্পর্কে উন্নীত হয়েছিল। সব সহকর্মীর সাথে হয়ত এ ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনা। এর জন্য যে অন্তরের ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয় তা আখলাকের মধ্যে ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তাই তাকে আপন করে নিতে খুব কম সময়ই লেগেছে।

চল্লিশের দশকে যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তুঙ্গে এবং সেই আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে শিক্ষিত মুসলিম তরুন সমাজ আন্দোলিত ও দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত তখন যে কয়জন মুষ্টিমেয় মুসলিম তরুণ সেই আন্দোলনের জোয়ারকে অগ্রাহ্য করে, দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল এবং স্রোতের প্রতিকূলে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে আখলাক ছিল অন্যতম। আখলাকের যে সমস্ত বিশেষ গুণ আমাদের সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেহনতী মানুষের জন্য তার গভীর মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ কোন ভাসাভাসা আবেগমাত্র ছিলনা কিম্বা দূর থেকে সহানুভূতি বা করুণা প্রকাশের সমতূল্য ছিলনা। গ্রামের দরিদ্র মানুষেরই একজন হয়ে, সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান হয়ে গ্রামের শোষিত মানুষের দুঃসহ জীবন যাত্রার কঠিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়েই সে মেহনতী মানুষের সাথে একাত্ম হতে পেরেছিল এবং তার হৃদয়ের গভীরে তাদের জন্য এই মমত্ববোধ দৃঢ় মূল বিস্তার করেছিল। উচ্চ শিক্ষিত হয়ে শহুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার পরও সে কখনও ভুলে যায়নি যে, সে এদেশের একটি নিপীড়িত কৃষক পরিবারেরই সন্তান। নিরহঙ্কার, আকাশের মত উদার একটি অন্তর, পরকে আপন করার অসীম ক্ষমতা, আলাপচারিতায় হাস্যরস ও ব্যঙ্গ কৌতুক সমৃদ্ধ ভাষা

প্রয়োগের মাধ্যমে আসর সরগরম করার অসাধারণ দক্ষতা, স্পষ্টবাদিতা, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, কর্মে উৎসাহ উদ্দীপনা, রাজনৈতিক দুর্যোগকালে দৃঢ়তা ও সাহসিকতা এ সবই ছিল আখলাকের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সিলেটিদের মধ্যে আলাপ আলোচনা কালে সঙ্গত কারণেই সীলেটের আঞ্চলিক ভাষাই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আখলাকের সাথে আমাদের এই অতিপ্রিয় ভাষাটির মাধ্যমেই পারস্পরিক সম্পর্ক বিকশিত ও নিবিড়তর হয়। আমার স্মৃতিতে আজ আখলাকের সেই শ্রুতিমধুর আঞ্চলিক ভাষার কথোপকথনের চমৎকার দৃশ্যগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। কানে বাজছে তার কথা, তার বাচনভঙ্গি ও জোরালো কন্ঠের এমন একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্যকে আকৃষ্ট না করে পারতনা। আমার ধারনা আখলাকের আবেগ উচ্ছাস ভালবাসা, ঘৃনা ক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশের এবং ব্যঙ্গ কৌতুক, হাস্যরস পরিবেশনের উপযুক্ত মাধ্যম ছিল সিলেটি ভাষা। মনের ভাবকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বোধ করি আখলাকের সিলেটি ভাষার কোন জুড়ি ছিলনা। শুদ্ধ ষ্ট্যান্ডার্ড ভাষায় তার বক্তব্য বা বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার খুব কমই হয়েছে। কাজেই তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কানের কাছে এখন অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে সিলেটি ভাষায় উচ্চারিত তার মিষ্টি সম্ভাষণ ও আবেগ মাখানো কথোপকথন।

আখলাকের সাথে আমার জীবনের বহু ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার কয়েকটির উল্লেখ করছি যাতে ঐ মানুষটিকে কিছুটা চেনা যায় ও তার গুণগুলো উপলব্ধি করা যায়। তখন কেবলমাত্র দেশভাগ হয়েছে, পাকিস্তানী আমল শুরু হয়ে গেছে। তবে বৃটিশ আমলে আন্দোলন সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমরা তখনও ছাত্র ফেডারেশনের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এদিকে পাকিস্তানী শাসকদের স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উন্মোচিত হতে মোটেই দেরী হয়নি। একদিকে কমিউনিস্ট সহ সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে দমননীতির খড়গ উত্তোলিত অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি প্রয়োগের নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবিত। এ অবস্থায় আমাদের কোন স্বস্তি ছিলনা, বিপদের আশঙ্কা মাথায় নিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। নিদারুণ এক দুঃসময়। এমনি এক সময়ে আমি আর আখলাক সুনামগঞ্জ গিয়েছিলাম সেখানকার ছাত্র ফেডারেশন সম্মেলনে অতিথি হয়ে। সম্মেলনের প্রথম পর্ব নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল। দুপুর বেলা বিরতির সময় আমরা দুজনই খেতে গিয়েছিলাম অনিমাদের (শ্রদ্ধেয় মণি সিংহের স্ত্রী) বাড়ি। অনিমার ছোট ভাই মঞ্জু তখন সেখানকার একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ছিল। মাসীমা (অনিমার মা) আমাদের খাবারের সব ব্যবস্থা করে খেতে ডাকলেন। আমরা খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। তাই দেরী না করে খাবার জায়গায় চলে গেলাম। মাসীমা পরিপাটি করে মেঝের ওপর কাঠের পিঁড়ি বিছিয়ে রেখেছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সহ আমরা সবাই এক একটা পিঁড়ি দখল করে খেতে বসে পড়লাম। মাসীমা পরম যত্নে তার হাতে রান্না সুস্বাদু খাবার একের পর এক পরিবেশন করতে লাগলেন। আখলাক

খেতে খেতে তার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে হাসি, গল্প, রসিকতা দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। হঠাৎ জরুরী খবর নিয়ে এলো দু'জন ছাত্র কর্মী – পুলিশ খুঁজছে আখলাক ও আমাকে। এ বাড়িতেও আসতে পারে। অতএব এক্ষুনি পালাতে হবে। মুহূর্তে সবার মুখের হাসি উবে গেল, পরিবর্তে সবার চেহারায় উদ্বেগ ও শঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠল। আমরা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়লাম। এ অবস্থায় মাসীমা সবচাইতে বেশী মনঃকষ্ট পেলেন। আমরা মাসীমা ও অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আখলাক গম্ভীর হয়ে কিছু ভাবছিল। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরন করে চলছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আখলাক মনে মনে বুদ্ধি আঁটছে কোথায় কিভাবে যেতে হবে। আমি তখন সম্পূর্ণ আখলাকের ওপর নির্ভরশীল। কোন রাস্তায় পালাতে হবে, কোনটা বেশী নিরাপদ এসব ভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব ওর ওপরই ছেড়ে দিলাম। কারন এখানকার রাস্তাঘাট যানবাহন বাড়িঘর গ্রাম সম্পর্কে ওরই ভাল ধারণা আছে, আমার নেই। তাছাড়া আখলাকের উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার ওপর আমার ছিল অগাধ আস্থা। আসলেই সে ছিল নির্ভর করার মত একজন দায়িত্বশীল সহকর্মী।। শেষ পর্যন্ত কিভাবে সুনামগঞ্জ থেকে সীলেটে পালিয়ে এলাম তার বিস্তৃত বিবরন দেওয়া সম্ভব নয়, সব কিছু মনেও নেই। কিন্তু কতগুলো দৃশ্য এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে।

আমরা যখন হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা ক্লান্ত, তখনই শুরু হল প্রবল বর্ষণ। রাস্তা ঘাট সব কর্দমাক্ত ও পিছল হয়ে পড়েছে। এরই মাঝে আমরা দু'জন হেঁটে চলেছি। কাপড় চোপড় সব ভিজে এক সা। ভিজে কাপড়ে পিছল মাটিতে হাঁটাও খুব কঠিন। আমি তো প্রতি পদে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। সারা পথ আখলাকই আমাকে টেনে নিয়ে গেছে, লক্ষ্য রেখেছে যাতে আমি পড়ে না যাই। নিজের কথা না ভেবে বৃষ্টির হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের ছাতা খানা মেলে ধরেছে আমার মাথার ওপর। আমি আপত্তি করাতে রেগে গিয়ে বলেছে, "অখন বদ্রতা করার সময় না। তুমার তন্ ছুট অইলে কিতা অইব আমি অখন তুমার গাইড। আমি যেমনে কইমু হেম্নে চলবায়। বেশী মাতিওনা চুপচাপ আটো" সত্যি সারাক্ষণ সে অন্ধের যষ্টির মত আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেছে। কোন এক জায়গায় এসে আমরা বাস ধরলাম। বাসে ওঠার আগে পাশের দোকান থেকে চা খাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিল আখলাক। বৃষ্টিতে ভেজার পর দু'জনেই চা খেয়ে বেশ চাঙ্গা বোধ করলাম। বাসে উঠে বসার পর আখলাকের গুরুগম্ভীরভাব কেটে গেছে, দীর্ঘ সময়ের নীরবতার পর আবার হালকা মেজাজে কথা বলা শুরু করেছে। তবে দু'জনেই আমরা হুঁশিয়ার, বাসভর্তি নানা রকমের লোক, এর মধ্যে টিকটিকি থাকাও অস্বাভাবিক নয় কাজেই আমরা কথা বলছি খুব সাবধানে রাজনৈতিক ভাষা সম্পূর্ণ পরিহার করে। কিন্তু এরই মাঝে আখলাক নানা সাঙ্কেতিক শব্দ আমদানী করে পাকিস্তান সরকার, পুলিশ, গোয়েন্দা এদেরকে ইচ্ছেমত গালাগাল করতে লাগল। ওর সেই খিস্তি শুনে আমার পক্ষে

হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। বিপদের সময়ে পরিবেশকে হালকা করার, অন্যকে হাসাবার ও আনন্দ দেবার ক্ষমতা যে রাখে তার তুলনা হয়না। আমি জানি পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় আমি সঙ্গে থাকায় আখলাকের অনেক বেশী কষ্ট হয়েছে এবং ঝুঁকিও নিতে হয়েছে অনেক। এর জন্য আমি যে ওকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাব সে সাহস আমার ছিলনা। আমি জানতাম এসব বললে সে ভয়ানক রেগে উঠবে কারণ তার ও আমার মধ্যে ধন্যবাদ বিনিময়ের কোন কৃত্রিম ভদ্রতার সম্পর্ক ছিলনা। তাছাড়া কোন কৃত্রিম আচার আচরণই সে পছন্দ করতনা। বাসে বসে গল্প করছি কিন্তু একবারও আখলাককে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করিনি যে কোথায় যাচ্ছি, কোথায় নামব। তবে বাসটা যে সিলেট শহরের দিকে যাচ্ছে সেটা জানতাম যদিও নামব কোথায় সেটা ছিল অনিশ্চিত। পুলিশ যাদের ধাওয়া করে তাদের জন্য শহরের বাসষ্ট্যান্ড নিরাপদ ছিলনা। কাজেই শহরের সীমানায় পৌঁছার আগেই আখলাক আমাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল এক অখ্যাত স্টপেজে যেখানে রাতের গাঢ় অন্ধকারে মানুষ চেনার কোন উপায় ছিলনা। নামার জায়গাটা সঠিকভাবেই বেছে নিয়েছিল আখলাক। যাই হোক আমরা নিরাপদে সিলেট শহরে ঢুকতে পারলাম। আখলাক আমাকে আমার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে রওয়ানা হ'ল।

বোধ হয় এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই আমরা আবার একত্রিত হলাম ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে (আবার এই প্রথম সম্মেলনই ইতিহাসে শেষ সম্মেলন হিসেবে চিহ্নিত হ'ল)। সরকারের দমননীতির খড়্গ এই সম্মেলনকেও পন্ড করে দিতে চাইল। নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল। আমরা সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে সম্মেলন করলাম। এরপর শুরু হল পুলিশের ধাওয়া এবং আমাদের পলায়ন। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম আমরা। প্রত্যেকে নিজের নিজের পালাবার রাস্তা নিজেরাই খুঁজে বার করেছিল। শেষে এক পর্যায়ে ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে আমরা সিলেটের কয়েকজন একত্রিত হলাম এবং সেখানেই আরও অনেকেরই দেখা পেলাম। স্টেশনের এক কোণে আখলাককেও দেখলাম। ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির মত এলোমেলো চুল ও পোশাকে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। নিরাপত্তার কারণে আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, কেউ কারো সাথে তেমন কোন কথাবার্তা বলছিনা। পায়চারী করছি আর অপেক্ষা করছি যার যার ট্রেনের জন্য। পায়চারী করতে করতে এক সময় সুযোগ বুঝে আখলাকের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ফিসফিসিয়ে বলল, "এরে হুন, সাবধানে যাইও, আলামত বালা নয়। তুমার লাগি বেশী চিন্তা আমার। আমি আর অখন সিলেট যাইরাম না, ঢাকাত যাইরাম। ফিরি আইলে দেখা অইব।" আমি তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমরা ফিরে চললাম দুই ভিন্ন দিকের ট্রেনে, আখলাক ঢাকার ট্রেনে, আমরা সিলেটের ট্রেনে।

১৯৪৮-এর শেষভাগ থেকে আমাকে কড়াকড়ি নিয়ম মেনে আত্মগোপন অবস্থায় চলে যেতে হল। দমননীতির তীব্রতা এতই বাড়ছিল যে আর আধাগোপন আধাপ্রকাশ্য অবস্থায় থেকে কাজ করা সম্ভব ছিলনা। অনেক কমিউনিস্ট কর্মী তখন গ্রেপ্তার হয়ে জেলখানায় বন্দী, অনেক হিন্দু কর্মী ও নেতা দেশ ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করেছেন, বাকিরা আত্মগোপনে থেকে পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি নান্‌কার আন্দোলন সহ অন্যান্য আন্দোলন–সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এরকম একটি টালমাটাল অবস্থায় আখলাকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগটা বেশ কিছু দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেই যে ময়মনসিংহ রেল স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা তারপর আর দীর্ঘদিন তার দেখা পাইনি। খবর পেয়েছিলাম যে ও ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে থাকছে। এক সময় খবর পেলাম ও বিয়ে করেছে, তারপর ওর একটি মেয়ে হয়েছে যার নাম রেখেছে তানিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট্ হিটলারের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর তরুনী তানিয়া'র নামটি কিংবদন্তীর মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বিশযভাবে সমাজতন্ত্রীদের মাঝে। এই নামের প্রতি আখলাকের আকর্যণের কারণ সহজেই বোধগম্য। আখলাক যখন যুবনেতা তছুদ্দুক আহমদ সহ গেন্ডারিয়ার ঢালকানগরের ৮০নম্বর বাড়িতে সংসার পেতেছে তখন থেকে যতদিন ঐ বাড়ি ছিল ততদিন আত্মগোপনকারী নেতারা বিশেষ করে সিলেটি নেতারা কোন প্রয়োজনে ঢাকা এলে এই বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। আমার স্বামী রোহিণী দাসও আত্মগোপন অবস্থায় কিছুদিন এসে তার ঐ বাড়িতে ছিলেন। আমি নিজে দু'বার গেছি ঐ বাড়িতে। তখন যদিও সে ব্যক্তিগত জীবনে নানা দুঃখ যন্ত্রণার ভার বহন করে চলছিল, হতাশার শিকার হয়েছিল তবু রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তার আনুগত্য এতটুকু শিথিল হয়নি। তখনকার পরিস্থিতিতে যেভাবে পেরেছে সেভাবেই সে দেশের জন্য, তার পার্টির জন্য অবদান রেখেছে। এরপর আবার দীর্ঘ কতগুলো বছর তার সাথে যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সর্বশেষ ঢাকায় যখন ওর সাথে দেখা হয় তখন বোধ হয় ওর প্রথম স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের পুরোপুরি ছেদ ঘটেছিল। তাকে দেখে খুশী হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তার পারিবারিক জীবনের ছিন্নভিন্ন অবস্থার কথা শুনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝেই ভাবতাম এমন হাসি খুশী দিলদরিয়া মানুযটির ব্যক্তিগত জীবন এমন কেন হ'ল?

দশবছর আত্মগোপন থাকার পর আমি সিলেট ছেড়ে ঢাকায় এসে প্রথমে গেন্ডারিয়ার মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী নিলাম, তারপর ১৯৬১তে নারায়নগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়ে স্কুল কোয়ার্টারেই প্রথম সংসার পেতে বসলাম। আমার স্বামীও তখন অসুস্থ হয়ে আমার কাছে চলে এসেছেন। আখলাক কোথায় আছে, কেমন আছে কোন খবরই জানতামনা। ১৯৬৪ 'এর জানুয়ারী মাসে শুরু হল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঢাকা, নারায়নগঞ্জের অনেক হিন্দু পরিবার তখন বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে চলে গিয়েছিল। আমি আশ্রয় শিবিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি কারণ

মহকুমা প্রশাসক থেকে আরম্ভ করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সব সদস্য আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, পাশের বস্তির মেয়ে পুরুষেরা সারাক্ষন পাহারা দিয়ে রেখেছে। কাজেই স্কুল কোয়ার্টারে আমি সপরিবারে খুবই নিরাপদে ছিলাম। দাঙ্গা শুরু হওয়ার দু'দিন পর হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে এলেন, পরিচয় দিলেন তিনি সঙ্গীত শিল্পী লোকমান হোসেন ফকিরের বড় ভাই আফাজউদ্দিন ফকির। স্কুলের পাশেই তাদের বাড়ি। তিনি বললেন, এর আগের রাতে ঢাকা থেকে তার বন্ধু আখলাকুর রহমান ফোন করে আমার পরিচয় দিয়ে বলেছে যে সে আমাদের জন্য খুবই চিন্তিত। ফকির সাহেব যেনো অবিলম্বে আমাদের খবর নিয়ে ওকে জানান, প্রয়োজনে ও গাড়ী নিয়ে এসে আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে। ফকির সাহেবের কাছ থেকে আখলাকের ফোন ও আমাদের জন্য তার দুশ্চিন্তার খবর পেয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারিনি। আমি যেনো নতুন করে আখলাকের মহৎ অন্তরটাকে আবার আবিষ্কার করলাম। ফকির সাহেবকে বললাম, "ওকে জানাবেন আমরা নিরাপদে আছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে ও যদি এরমধ্যে একদিন আসে তাহলে নতুন করে সাহসও পাব, ভালও লাগবে। ওকে আসতে বলবেন।' ফকির সাহেব খবর নিয়ে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে চিন্তা করছিলাম দীর্ঘদিন যে লোকটার কোন খোঁজখবর নেইনি, বছরের পর বছর যার সাথে দেখা করার চেষ্টাও করিনি, যার ঠিকানা, খবরাখবর জানার কোন উদ্যোগ নিইনি সেই লোকটি কিন্তু আমাদের বিপদের কথা ভেবে ঠিকই আমাদের স্মরণ করেছে, সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হ'ল নিখোঁজ হওয়া মানুষটিকে যেনো আবার ফিরে পেলাম যে মানুষটির অন্তর এতটুকু বদলায়নি। তাছাড়া যে আখলাক ছাত্র জীবন থেকে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এসেছে, ঝুঁকি নিয়েছে তার পক্ষে এই ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে অস্থিরতা বোধ করা ও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা কোনটাই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। আমাদের জন্য তার গভীর মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় অনুভূতির এই অভিব্যক্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিব্যক্তি ছিলনা, মূলতঃ এর ভিত্তি ছিল তার নীতি আদর্শ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আমাদের সাথে এক মহান আদর্শের বন্ধন। এই বন্ধনকে আজীবন সে অন্তরে লালন করে এসেছিল। ফকির সাহেব দেখা করে যাওয়ার ২/৪ দিন পর আখলাক ঠিকই এসে হাজির হয়েছিল আমার কোয়ার্টারে। আগের মতই তার স্বভাবসুলভ উচ্ছলতায় হাসি গল্পে হৈ চৈ করে মাতিয়ে তুলেছিল। এর মধ্যে রাজনীতি, দেশের পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনাও স্থান পেয়েছিল। অনেক অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগও করা হয়েছিল যাওয়া-আসা, যোগাযোগ না করার জন্য। এ ব্যাপারে আমার নিজের অপরাধ বোধ ও ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও ওকে একটু খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলামনা। বললাম, "তুমি তো এখন অনেক ওপরে উঠে গেছ, গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াও। তোমার বাড়ীতে যেতেও তো সাহস

পাইনা। বরং তুমি তো ইচ্ছে করলেই গাড়ী নিয়ে চলে আসতে পার।" সে উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল, "তুমি ইতা কিতা মাত ? আমি যে চাযার পুয়া, হউ চাযার পুয়াওই আছি। তুমি আমারে কিতা মনে কর ?" ওর উত্তেজনা কমাতে আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নিলাম। চারদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার পরিবেশে ওর সান্নিধ্যে ভারি আনন্দে কাট্‌ল দিনটা। আবার দীর্ঘ দু'বছর দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ বন্ধ।

১৯৬৫তে আমি স্কুল বদল করে চলে গিয়েছি মহাখালি ওয়ারলেস স্টেশনের একটি স্কুলে। স্কুল সংলগ্ন কোয়ার্টারেই থাকি। ঐ বছরই এম, এ, প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। ১৯৬৬তে ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। যদিও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিলাম তবু প্রায়ই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যেতাম। এমনি একদিন ক্লাস শেষে ভরদুপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি বাসের প্রতীক্ষায়। রোদে পুড়ে যাচ্ছি অথচ বাসের কোন খবর নেই। হঠাৎ দেখি একটা প্রাইভেট কার ব্রেক কযে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চম্‌কে উঠলাম কে এই কারের আরোহী। মুহূর্তের মধ্যেই কার থেকে নেমে এলো আমার উদ্ধার কর্তা ভাই আখলাক। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমাকে এক রকম হুকুম দিয়ে ওর গাড়িতে উঠিয়ে নিল। আমি কোথায় আছি, কি করছি, এখন কোথায় যাব ইত্যাদি জেনে নিয়ে বলল, "অখন আমি তুমারে লই যাইমু আমার বাসাত্, হন গিয়া ভাত খাইয়া বিশ্রাম করবায়। তারপরে বিকালে আমি তুমারে মহাখালি পৌছাই দিমু"। "তথাস্তু" বলে আমি ওর সাথে চললাম। ওর বাড়িতে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলের সামনে বসলাম। শুরু হল গল্প গুজব। আমি বাংলায় এম, এ, পরীক্ষা দিচ্ছি জেনে বলল, " তুমি এর পরে অর্থনীতি লইয়া পড়, আমি তুমারে সাহায্য করমু। আমি উত্তর দিলাম, "তোমার নাগাল ধরতে পারলে বাংলায় না পড়ে, অর্থনীতিতেই পড়তাম। ভবিষ্যতে আর পড়তে পারব বলে মনে হয়না।" খাবার টেবিলে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। বোধ করি ওর বন্ধুস্থানীয় কেউ হবেন। আলাপ করতে করতে ভদ্রলোক এক পর্যায়ে বললেন, "তোমার ঐ গাড়িটাতো আর চলেনা। তুমি আর একটা ভাল দেখে গাড়ি কেনো।" আখলাক উত্তর দিল," জাননি আমার বাপে অখনও গামছা পিন্দি ক্ষেত হালচায করইন। আমার মত চাযার পুয়ার একখান গাড়ী আছে হউটাইতো বেমানান। আর একখান গাড়ির কথা আর মাতিও না।" উত্তরটা ঠিক আখলাকের উপযোগী উত্তর। মানুযটার সামাজিক অবস্থান ও বাহ্যিক জীবন যাত্রার বহু পরিবর্তন ঘট্‌লেও অন্তরটা একেবারেই পাল্টায়নি। বিকেলের দিকে ও আমাকে পৌছে দিল মহাখালি। কিছুক্ষণ আমাদের বাড়িতে বসে রোহিণী দাসের সঙ্গে গল্প গুজব করল। কথাবার্তায় অবশ্যই রাজনীতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এক সময় সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার সাথে ঐ দেখাই যে শেষ দেখা হবে কে,জানত।

স্বাধীনতার পর এক পর্যায়ে জানাতে পারলাম আখলাক জাসদে যোগ দিয়েছে। আমাদের মধ্যে মত ও পথের বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু তবু সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছিলাম

এই ভেবে যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ সে পরিত্যাগ করেনি। তারপর থেকে আখলাকের যেটুকু খবরাখবর পেয়েছি তা প্রধানত সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন থেকে এবং শেষ দিকে আমার দাদা বারীন্দ্র দত্তের মাধ্যমে। দাদার সাথে তার মাঝে মধ্যে দেখা হত। যতদূর মনে পড়ে কর্নেল তাহের অভিযুক্ত হওয়ার সময় সেও অভিযুক্ত হয়েছিল এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মাঝে মাঝে ওকে দেখার খুব ইচ্ছে হত কিন্তু সে ইচ্ছে আর কখনও পূরণ হয়নি। ওর মেয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য খবর পাঠিয়েছিল, কিন্তু যাব স্থির করেও যেতে পারিনি। এতদিন জানতাম সে আছে, ইচ্ছে করলেই দেখা করা যায়। কখনও ভাবিনি বয়সে ছোট হয়ে আমার আগেই সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। আমার প্রতিদিনের জীবন থেকে আখলাক অনেক দূরে সরে গেলেও সে যে আমার অন্তরের গভীরে কতখানি স্থান জুড়ে ছিল তা নতুন করে উপলব্ধি করলাম যেদিন টিভির সামনে বসে আকস্মিকভাবে ওর মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। ওর অসুস্থতার কোন খবরও আমি জানতামনা। শোকাহত হৃদয়ে কেবল অনুশোচনাই হতে লাগল এমন একটি মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে বড় অসময়ে বিদায় নিল যখন এ ধরনের দৃঢ়চেতা মানবদরদী, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নীতিনিষ্ট মানুষের খুব বেশী প্রয়োজন আমাদের দেশে। যখন সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে তখনও মানুষের শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অবিচল থেকে আখলাক আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অতীতে যার যত ভুল ত্রুটি হোক্ না কেন, যত ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ই ঘটুক না কেন শোষন মুক্তির সংগ্রাম তথা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। এর জন্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সব শক্তিকে এক যোগে সঠিক পথের নিশানা বের করতে হবে।

অধ্যাপক আখলাকের সাথে আমার পরিচয় ছিলনা, যদিও তার পান্ডিত্য ও প্রতিভার খবর আমি জানতাম। আমি চিনতাম এক অসাধারণ আবেগপ্রবণ, দেশপ্রেমিক, মানবদরদী ও নীতিনিষ্ট মানুষ আখলাককে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আখলাককে। আমি আশা করব তার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য এগিয়ে আসবেন তার ঘনিষ্ট সহকর্মীরা। এই মূল্যায়ন শুধু আখলাকের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যই নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রেরণা দানের জন্যও প্রয়োজন।

মৃত্যুর পর আখলাকের নিথর নিস্পন্দ দেহ দেখার ইচ্ছে আমার হয়নি। তাকে আমি পুষ্পস্তবক দিতে যাইনি, তাকে শেষ সম্মান জানাবার সুযোগ পাইনি। এই লেখাটি হোক একটি পুষ্পস্তবক, আখলাকের স্মৃতির প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও সম্মানের নিদর্শন।

[আখলাকের মৃত্যুর ৪/৫ দিন পরই এটি লেখা হয়েছিল।]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও
সিলেটের গণনাট্য আন্দোলন

হেমাঙ্গদার মৃত্যু আবার স্মরণ করিয়ে দিল চল্লিশের দশকের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা, সিলেট, কাছাড় ও সমগ্র আসামে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে হেমাঙ্গদার বিরাট অবদানের কথা। আমার বিশ্বাস ঐ সময়টাই হেমাঙ্গদার জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় এবং তার প্রতিভা বিকাশের তুঙ্গ কাল। ঐ সময়ে সিলেটে যাঁরা হেমাঙ্গদার সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাথে কাজ করেছেন এরকম লোক বাংলাদেশে এখন হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র আছেন। আমি তাঁদেরই একজন। হেমাঙ্গদার পরিচালনাধীন সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের একজন নগণ্য সদস্য হিসাবে গণনাট্য আন্দোলনে হেমাঙ্গদার অবদান সম্পর্কে কিছু লেখা তাই অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করছি।

প্রথম যেদিন হেমাঙ্গদার সাথে দেখা হয় সেদিনটির কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। শিলং গিয়েছি ছাত্র সংগঠনের কাজে। সেখানে আমার সহকর্মী বান্ধবী অঞ্জলি আমাকে নিয়ে গেল একটি বাড়িতে হেমাঙ্গদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। আগেই শুনেছিলাম হেমাঙ্গ বিশ্বাস সিলেটের একজন কবি, নির্যাতিত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট। কিন্তু নানা অনিয়ম ও নির্যাতনে তিনি তখন খুবই অসুস্থ, টি,বি, রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন। বিছানায় শুয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশছেন– এমন অবস্থায় তাঁকে দেখলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন। রোগ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে আমাদের সাথে হেসে হেসে কথা বলার চেষ্টা করলেন। এত মিশুকে স্বভাব ছিল তাঁর যে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের আপন করে নিতে পেরেছিলেন। সেদিন তাঁকে দেখে যত আনন্দ পেয়েছিলাম তার চাইতে বেশী দুঃখ পেয়েছিলাম এমন চমৎকার এই মানুষটিকে কঠিন রোগাক্রান্ত দেখে। তখন ভাবতেও পারিনি যে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। গভীর উদ্বেগ আর আশংকা নিয়ে সেদিন তাঁর ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য তাঁর অদম্য মনোবল, সুচিকিৎসা ও সহকর্মীদের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সিলেটে এসে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী, সঙ্গীতের জ্ঞান, সুরেলা কণ্ঠ ও সাংগঠনিক প্রতিভাকে সম্বল করে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সিলেটকে কেন্দ্র করে সারা সুরমা উপত্যকায় (কাছাড় সহ) হেমাঙ্গদাই গড়ে তুললেন গণনাট্য আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট দাবানলের হিংস্রতায় বিপন্ন মানবজাতির সংকট, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতায় নিঃস্ব মানুষের হাহাকার, পরাধীনতার জ্বালা হেমাঙ্গদার সংবেদনশীল কবি মনকে সৃষ্টির বেদনায় অস্থির করে তুলেছিল। তিনি এ সময় অসংখ্য গান লিখলেন, প্রায় প্রত্যেকটি গানে নিজেই সুর সংযোজনা করলেন। তবে গান সৃষ্টি করাই তার একমাত্র কাজ ছিল না। সিলেটের শিল্পীদের নিয়ে তিনি সুরমাভ্যালী (সিলেট কাছাড় নিয়ে গঠিত) কাল্‌চারাল স্কোয়াড গঠন করেছিলেন। গানের শিক্ষক হিসেবে প্রতিদিন তিনি শিল্পীদের গানের তালিম দিতেন। রিহার্সাল নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারতেন না। শিল্পী সংগ্রহ, বিভিন্ন গানে উপযুক্ত শিল্পী নির্বাচন, বাইরে সফরে যাওয়ার জন্য অল্প বয়সী মেয়েদের অভিভাবকদের অনুমতি আদায়, অনুষ্ঠান সূচীর পরিকল্পনা, পরিমার্জনা, সংশোধন, সংযোজন, শহর থেকে গ্রামে গণনাট্য আন্দোলনের বিস্তার প্রভৃতি কাজে হেমাঙ্গদাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন যদিও সমষ্টিগত উদ্যোগ ও কাজের ধারাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব গানের স্কোয়াড গঠনেও তাঁর অবদানই ছিল সব চাইতে বেশী।

একজন কমিউনিস্ট হিসেবে হেমাঙ্গদা একদিকে যেমন জনজীবনের সাথে গভীরভাবে একাত্ম ছিলেন তেমনি জনগণের মুক্তি সংগ্রাম ও তার লক্ষ্য সম্পর্কেও ছিলেন পরিপূর্ণ সচেতন। তাই তাঁর গানের মর্মবস্তু হয়েছে জনগণের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এবং তাদের মরণপণ বলিষ্ঠ সংগ্রামের হাতিয়ার। তাঁর গানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষ–পীড়িত মানুষের মর্মান্তিক কষ্ট ও হাহাকার, ফুটে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দানবের ভয়ঙ্কর রূপ, চিত্রিত হয়েছে পুঁজিপতি, জমিদার, মহাজন, কালোবাজারী মুনাফাখোরদের নিষ্ঠুর শোষণের চিত্র। পাশাপাশি তাঁর গান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শাসক শোষক শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণা, মুক্তিপাগল জনগণের বলিষ্ঠ সংগ্রাম ও তাদের লৌহ দৃঢ় সংগ্রামী প্রত্যয়। হেমাঙ্গদার গানের ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল, তাই পল্লী ও শহরের নিরক্ষর মানুষের কাছেও তা সহজেই গৃহীত হত। বহু গানে তিনি সিলেটের আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে গানগুলোকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। গানের সুরের জন্য তিনি হাত বাড়িয়েছেন বাংলার পল্লী সঙ্গীতের অমূল্য ভান্ডারের দিকে–যে পল্লীসঙ্গীতের বিচিত্র সুর যুগ যুগ ধরে গাঁয়ের সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আসছে এবং বাংলার আকাশে বাতাসে মাটিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে বাঙালীর অন্তরকে রসসিক্ত করে রেখেছে। ভাটিয়ালি, সারি গান, হোলিখেলার গান, মৈমনসিংহের বাইদ্যার গান, সিলেটের ধামাইল গান প্রভৃতি নানা ধরনের ঐশ্বর্যমন্ডিত লোক সঙ্গীতের সুর ও আঙ্গিকে হেমাঙ্গদা সৃষ্টি করেছেন নয়াযুগের গণসঙ্গীত। গানের মর্মবস্তু অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ধরনের সুরের সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন। দেশ, কাল ও জনগণের প্রয়োজনে রচিত ও

উৎসগীকৃত গানের নতুন মর্মবাণীর সাথে কালজয়ী সুরের সংমিশ্রণে হেমাঙ্গদার গান এদেশে গণসঙ্গীতের ইতিহাসে এক নতুন বলিষ্ঠ ধারার জন্ম দিয়েছে, সূচনা করেছে এক নতুন অধ্যায়ের। তাঁর গান তাই গণনাট্য আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে আজও। চল্লিশের দশকে যাঁরা ভারতে শ্রেষ্ঠ গণসঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে গণনাট্য আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদেরই অন্যতম। জনগণের অন্তরে গভীর আবেদন সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল হেমাঙ্গদার গানের। তাঁর গান অসংখ্য মানুষকে কাঁদিয়েছে, মানুষের জন্য মানুষের অন্তরে জাগিয়েছে গভীর মমত্ববোধ, শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের হৃদয়ে জ্বেলেছে ঘৃণা ও ক্ষোভের আগুন, হতাশাগ্রস্ত মনে এনেছে আশার আলো, জনগণের সংগ্রামী প্রত্যয়কে করেছে লৌহদৃঢ়।

হেমাঙ্গদার গান সারা বাংলায় বিশেষভাবে সিলেট ও গোটা সুরমা উপত্যকায় শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে মূলতঃ সুরমাভ্যালী কালচারাল স্কোয়াড, সিলেট জেলা পার্টির নিজস্ব স্কোয়াড এবং বাংলার গণনাট্য সংস্থার মাধ্যমে। তাছাড়া সিলেটের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা গণসংগঠন তাদের নিজ নিজ মঞ্চ থেকে হেমাঙ্গদার গানের ব্যাপক প্রচার চালায়।

হেমাঙ্গদার গানের আবেদন কত গভীর ছিল তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। '৪৩ অথবা '৪৪–এ সিলেট জেলার বানিয়াচং গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ ভয়াবহ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল । রোগে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। এমন কোন পরিবার ছিল না যেখানে রোগ ও মৃত্যু হানা দেয়নি। সে সময় হেমাঙ্গদা লিখলেন –

"বাইন্যাচঙে প্রাণ বিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী
হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়,
শান্তিভরা সুখের গেহ
শূন্য আজি নাইরে কেহ
মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপমায়"– ইত্যাদি

বানিয়াচঙের অসহায় মানুষকে বাঁচাবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও রিলিফ তৎপরতা শুরু হলো। চাঁদা তোলার জন্য আমরা হেমাঙ্গদার গানটিকে কণ্ঠে তুলে নিলাম। যখন আমরা দল বেঁধে গানটি গেয়ে পাড়া মহল্লায় চাঁদা তুলতে যেতাম তখন দেখতে পেতাম গান শোনার সাথে সাথে প্রতিটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছেন মেয়ে–পুরুষ সবাই। না চাইতেই তারা এগিয়ে এসে অশ্রুসজল চোখে দানের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবী শিল্পীদের আবেগ আর শ্রোতাদের অনুভূতি, চোখের জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা হেমাঙ্গদার গান কত অসংখ্য লোককে যে কাঁদিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আবার দুঃখ, হাহাকার আর কান্নার গানের পাশাপাশি হেমাঙ্গদা গেয়েছেন আশার গান, শুনিয়েছেন সংগ্রামের বাণী, তুলে ধরেছেন ভবিষ্যতের রঙীন ছবি।

হেমাঙ্গদার এসব লড়াইয়ের গান, আশার গান কেবল বাছাই করা শিল্পীদের কণ্ঠে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শিল্পীদের কণ্ঠ থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছিল হাজার হাজার কৃষকের কণ্ঠে, জনগণের কণ্ঠে। বড় বড় কৃষক জমায়েতে, জনজমায়েতে মিছিলে হাজার হাজার কৃষক জনতা বিপুল উত্তেজনায় গেয়েছে এসব গান। গানগুলো হয়ে উঠেছিল অসাধারণ জনপ্রিয়, জনতার গান।

নারীজাতির দুঃখ বেদনা ও লড়াইয়ের সংকল্প নিয়েও হেমাঙ্গদা গান রচনা করেছিলেন। অনাহার ও দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা সইতে না পেরে নারী সমাজের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ এবং বিদেশী সৈন্যের লালসার আগুনে বহু নারীর ইজ্জত বিসর্জনের ঘটনা হেমাঙ্গদার মনকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। ধামাইল গানের সুরে তিনি গান লিখলেন –

"তোরা বল্ সখী বল, বল আমারে
ওকে ঘরের বার কুলের বার করলো নারী রে।।
ছিল ছায়ায় ঢাকা পাখী ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর
স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের আদর
সেই ঘরে কে আগুন দিল, সর্বস্ব ধন নিল হরে।।'

… … … … …

'ওরে হতভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল
সর্বনাশের রসাতলে সমাজ হইল তল
দেশমাতা হয় কুলটা লম্পটের ব্যভিচারে।।"

আর একটি গানে লিখেছিলেন –

'ছিল আমার একটি বইন বড় সোহাগিনী
ক্ষুধার জ্বালায় মান বেঁচিয়া হইল কলঙ্কিনী
আজ নাই নাইরে।।" (বাইদ্যা গানের সুর)

ধামাইল সুরে আর একটি গানে লিখেছেন –

"তোরা দেখবি যদি আয়, কুলনারী লড়াইয়েতে যায়।

দেখবি যদি আয় সজনি, এবার মোরা মারবো জাপানী,
যে জাপানী চীন দেশেতে গড়াগড়ি যায় লো।।"

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ ও সারা আসামে গণনাট্য আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারের লক্ষ্যে হেমাঙ্গদার তত্ত্বাবধানে সুরমাভ্যালী কাল্‌চারাল স্কোয়াডের জন্য একটি চমৎকার অনুষ্ঠান-সূচীর পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং সিলেট কাছাড় সহ সারা আসামের বড় বড় শহরগুলোতে অনুষ্ঠান দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠান-সূচীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'পঁচিশে বৈশাখ'-এর গানের সাথে নাচ, কবিগুরু ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের অসাধারণ জনপ্রিয় 'নবজীবনের গান', হেমাঙ্গদার গান, শ্রমিকের যন্ত্রনৃত্য, কৃষকের নৃত্য প্রভৃতি বিচিত্র ও অভিনব নাচ-গানের সমন্বয় গতানুগতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে এই অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। অনবদ্য 'ভুখা নৃত্য' ছিল এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

গানের প্রশিক্ষণ দিতেন হেমাঙ্গদা নিজে, তাছাড়া গানের ব্যাপারে সুর সংগ্রহ সুর সংযোজনা, বাদ্যযন্ত্র পরিচালনা, ইত্যাদি কাজে যাদের কাছ থেকে হেমাঙ্গদা বিশেষ সহযোগিতা লাভ করেছেন এবং যাদের অবদানে গণনাট্য আন্দোলন অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে নির্মলেন্দু চৌধুরী, সুরথ পাল ও গোপাল নন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এর মধ্যে হেমাঙ্গদা ও নির্মলের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্মলের অসামান্য অবদানের বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যমণি ছিল নির্মল। নির্মলের একদিকে ছিল অনন্যসাধারণ একটি দরাজ সুরেলা কণ্ঠ ও আবেগময় প্রকাশভঙ্গি অন্যদিকে ছিল তার লোকসুরের সমৃদ্ধ ভান্ডারটি। সিলেটের গণনাট্য মঞ্চে হেমাঙ্গদা ও নির্মল এই দুই প্রতিভার সম্মিলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা-পরবর্তীকালে কবি ও গায়ক হিসেবে হেমাঙ্গদার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নির্মলেন্দু চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পেছনে সিলেটের গণনাট্য আন্দোলন ও তার প্রধান উদ্যোক্তা সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে তা অবশ্যই নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়। সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে নির্মলের পরে অন্য যে দুজন সঙ্গীতশিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তারা হলো শান্তা ও মায়া। অনেক দ্বৈত গানে শান্তা নির্মলের সাথে অংশ নিয়েছে, একক গানেও মায়ার সুমিষ্ট গলার জুড়ি ছিল না। অবশ্য গানের টিমে সাধারণ, অসাধারণ সব ধরনের শিল্পীই ছিল। হেমাঙ্গদা এদের সবাইকে একত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিখুঁত কোরাস গান পরিবেশনে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

প্রকৃতপক্ষে নাচ, গান কোনটাই একটা থেকে অন্যটা বিচ্ছিন্ন ছিল না। যেমন পুরো অনুষ্ঠান-সূচী একই লক্ষ্যে একটি মূলসূত্রে গাঁথা ছিল তেমনি সব নেতা ও প্রশিক্ষকের

মধ্যে ছিল ঘনিষ্ট সমন্বয়। এক লক্ষ্যে নিবেদিত নেতা, সংগঠক, প্রশিক্ষক, শিল্পী ও কারিগরদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল যৌথ কাজের ধারা ও গড়ে উঠেছিল গভীর চেতনা। বলা বাহুল্য সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তথা গণনাট্য আন্দোলনের মূল নেতা ও কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন হেমাঙ্গদা। তাঁর সহযোগী ছিলেন সুরথপাল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, আশুসেন, গোপাল নন্দী, পানুপাল, উষা দত্ত প্রমুখ সংগঠক ও বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়া এই প্রসঙ্গে চিত্র শিল্পী খালেদ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে পোস্টার শিল্পের ব্যবহার ও বিকাশের পাশাপাশি গণনাট্য আন্দোলনেও খালেদের অবদান অবিস্মরণীয়। হেমাঙ্গদার নেতৃত্বে ও সান্নিধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন স্কোয়াড এবং সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে গানে অংশ নিয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অবশিষ্টদের মধ্যে এখন একজনের নাম উল্লেখ করব যিনি এখনও সিলেটের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন বরুণ রায়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

সাংস্কৃতিক স্কোয়াড সিলেটের কাছাড়ের সবগুলো শহরসহ আসামের শিলা গৌহাটি, লামডিং প্রভৃতি বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করে তার অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এবং গণনাট্য আন্দোলনের বাণী সারা আসামে ছড়িয়ে দিয়েছে। একটি শহরে কেবল একরাত নয়, পর পর ২/৩ রাত 'শো' হয়েছে। প্রথম রাতের পরেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে মুগ্ধ দর্শকদের প্রশংসা বাণী, পরবর্তী রাতগুলোতে দর্শকদের ভিড়ের চাপ বেড়ে গেছে। এই চাপকে সামাল দিতে হয়েছে 'শো' এর সংখ্যা বাড়িয়ে। একই দর্শক প্রত্যেক দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এমন ঘটনা বিরল ছিল না। ব্যাপকভাবে আসাম সফরের ফলে অনুষ্ঠানের যে প্রভাব সেখানকার শিল্পী ও দর্শকদের উপর পড়েছিল তারই ফলে পরবর্তীকালে হেমাঙ্গদার পক্ষে 'নিখিল আসাম গণনাট্য সংঘ' গড়ে তোলা সহজে সম্ভব হয়েছিল। হেমাঙ্গদার কর্মক্ষেত্র সুদূর আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য পরম গৌরবের বিষয় যে সিলেটেরই নেতা ও শিল্পীদের অবদানে আসামে গণনাট্য আন্দোলন পুষ্ট হয়েছিল।

একটি অনুষ্ঠান যে দর্শকদের কতটা বিমোহিত করতে পারে, কী গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা তখন পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল না। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে হলঘরের পরিবেশ যেত সম্পূর্ণ পাল্টে। দর্শকদের অখন্ড মনোযোগ মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হতো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। প্রায় ঘন্টা তিনেকের বিরতিহীন অনুষ্ঠান চলাকালে হলে বিরাজ করত পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। একমাত্র 'ভুখানৃত্যে'র সময়ে শোনা যেত কান্নার আওয়াজ আর অনুষ্ঠান শেষে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচন্ড করতালির শব্দ। অনুষ্ঠানের সম্মোহন শক্তির প্রভাবে নির্বাক হয়ে যেত দর্শকমন্ডলী। দর্শকদের আবেগ ফুটে উঠত তাদের চোখে মুখে চেহারায়। কখনো আনন্দের উচ্ছলতা, কখনো বেদনার্ত হৃদয়ের বিষণ্ণতা, কখনো প্রবল

ঘৃণা, আবার কখনো সংগ্রামের বলিষ্ঠ উম্মাদনা। সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের এসব অনুষ্ঠানে প্রমাণিত হয় যে একটি জনসভা, একটি বক্তৃতা যত না প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

স্কোয়াডের অসাধারণ সাফল্যের অন্যতম বড় মাধ্যম ছিল সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতি সদস্যদের অবিচল নিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হয়েছিল একটি সুশৃঙ্খল আদর্শনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলা। নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারেও হেমাঙ্গদার বিরাট অবদান ছিল। এই অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ যেমন দর্শকদের মন কেড়ে নিত, তেমনি পরিচালক ও শিল্পীদের সময়ানুবর্তিতা ও গভীর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পেয়েও দর্শকরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হতেন।

সে সময় একটি স্কোয়াড গঠন ও স্কোয়াড নিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে সফরে যাওয়া খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। প্রধান সমস্যা হয়েছিল অল্প বয়সী মেয়ে শিল্পীদের অভিভাবকদের অনুমতি আদায়ের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে হেমাঙ্গদা ও অন্যান্য নেতারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্কোয়াডের সব নেতাই এই সব পরিবারের অভিভাবকদের কাছে গভীর আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে অনেক অভিভাবকের মতপার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তি কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁদের সবারই ছিল উচ্চ ধারণা। ফলে অভিভাবকদের অনুমতি লাভ সহজতর হয়েছিল। অনুমতি লাভের সাথে সাথে এসেছে দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব সম্পর্কেও হেমাঙ্গদারা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সীলেটের বাইরে যাওয়ার সময় মেয়েদের অভিভাবকত্ব করার জন্য সঙ্গে নেয়া হয়েছিল পার্টির ডাক্তার বেন্টুদিকে (ডাঃ কল্যাণী মিশ্র)। বেন্টুদি প্রকৃতই একজন কড়া অথচ স্নেহশীল অভিভাবক ছিলেন। তিনি যেমন অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন, তেমনি অসুখ বিসুখে চিকিৎসার কাজও করতেন। হেমাঙ্গদা নিজে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখতেন।

হেমাঙ্গদার কাজ কেবল গণনাট্য আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি গোটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তৃত পরিসরে। সিলেটে 'লেখক ও শিল্পী সংঘ' গড়ে উঠেছিল হেমাঙ্গদারই নেতৃত্বে। সপ্তাহে একদিন সংস্থার নিয়মিত আসর বসত। এতে স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, গান, আবৃত্তি সব কিছুই চলত। সিলেটের সেরা কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এই সংস্থার মধ্যে একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন কবি অশোক বিজয় রাহা (পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক)' গল্প লেখক সত্যভূষণ চৌধুরী (রসময় মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক), অধ্যাপক কৃপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন দাস, শ্যামধন সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। তঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু চিন্তাচেতনায় ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল।হেমাঙ্গদা এঁদের সবার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রগতিশীল ধারায় লেখক শিল্পী সংঘের বিকাশের

ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ সময় সারা ভারতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গণনাট্য সংঘের পাশাপাশি প্রগতিশীল লেখক –শিল্পীদের সংগঠন ও আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল, বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সংস্কৃতি–কর্মীদের ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন।

কবে কখন হেমাঙ্গদা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে গেলেন তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে সর্বশেষ যে অনুষ্ঠানে তাঁর পরিচালনায় তাঁরই রচিত গান গেয়েছিলাম সেই অনুষ্ঠানের স্মৃতি নানা কারণেই আমার মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৪৬–এ নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার প্রতিনিধির সমাগম ও লক্ষাধিক কৃষকের জমায়েত নেত্রকোণা শহরে এক উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিভিন্ন অধিবেশনের বিরতিকালে প্রতিনিধিদের শিবিরে বসত গানের আসর। সিলেটের শিবিরে এমনি এক আসরে এসেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি, সি, যোশী। হেমাঙ্গদার প্রতিভা ও তাঁর স্কোয়াডের খ্যাতির কথা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। অনেকগুলো গান তাঁকে শোনানো হলো। তিনি এবং আরও বহু শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। সে আসরে শ্রোতাদের যে গানটি সব চাইতে বেশী মুগ্ধ করেছিল তা হলো সিলেটেরই পল্লী কবি আবদুল গাফ্ফার দত্ত চৌধুরী রচিত খাঁটি সিলেটি ভাষার গান –

" গুয়া গাছে ট্যাক্র লাগিল্নি
বাটার উপর পইরলো ঠাটা গাল ভরি পান খাইতায়নি"।।

ঐ সময়ে সিলেটে গানটির অতি জনপ্রিয়তা হয়েছিল। সেদিন আসরে গানের শেষে কমরেড যোশীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। তবে নেত্রকোণা সম্মেলনে যোশীর প্রশংসার চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান লক্ষাধিক কৃষকের প্রশংসা পেয়েও ধন্য হয়েছিল সিলেটের স্কোয়াড। এবার সে অনুষ্ঠানটির কথা বলছি। লক্ষাধিক কৃষক জনতার জমায়েতে এক রাতে সিলেট স্কোয়াডের পক্ষ থেকে হেমাঙ্গদার নেতৃত্বে গান পরিবেশন করা হয়েছিল। মৈমনসিংহের বাইদ্যার গানের আঙ্গিকে ও সুরে হেমাঙ্গদা দীর্ঘ চমৎকার একটি গান তৈরি করেছিলেন। দুর্ভিক্ষে দুঃখ কষ্টের বর্ণনা, পরিশেষে বাঁচার জন্য সংগ্রামের অঙ্গীকার–– এই ছিল গানের বিষয়বস্তু। গানটির ক্ষুদ্রাংশ এরকম–

"কিষাণ – মৈমনসিংহের কৃষক আমি গফুর আমার নাম
কিশোর গঞ্জের মহকুমায় ছিল আমার ধাম
আজ নাই নাইরে।।
কিষাণী – বাইন্যাচঙের নারী ওগো আমি যে কিষাণী

আইজ আমি পথে পথে ঘুরি একাকিনী
হায় নাই নাইরে।।

এই গানে কৃষকের অংশে কৃষক বেশে গেয়েছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী আর কিষাণীর ভুমিকায় গাইতে হয়েছিল আমাকে। নির্মলের মত গুণী শিল্পীর সাথে একক কণ্ঠে আমার গান গাওয়া ছিল নিতান্তই বেমানান। তবু অন্য কেউ না থাকায় হেমাঙ্গদা আমাকেই সেই অমূল্য সুযোগ দিয়েছিলেন। একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে লক্ষাধিক জনতার সামনে দাঁড়িয়ে গণসঙ্গীত পরিবেশনের আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের সুযোগ আমার জীবনের এই প্রথম এবং শেষ। হেমাঙ্গদার পরিচালনায় ও সাহচর্যে গানে অংশ গ্রহণেরও পরিসমাপ্তি ঘটে নেত্রকোণা সম্মেলনেই। এরপর আসে নানা বিপর্যয় –'৪৭–এ দেশ বিভাগ, ভিন্ন রাষ্ট্র ভারতে হেমাঙ্গদার বাসস্থান, কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের হিংস্র দমননীতি, আত্মগোপন অবস্থায় আমাদের সব কিছু মিলে গানটির স্মৃতি, নেত্রকোণা সম্মেলনের স্মৃতি আজও আমার মনে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে গান জনতাকে মাতিয়ে তুলেছিল, সৃষ্টি করেছিল গভীর আবেদন সেই গানটির সাফল্যের মূল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গানের স্রষ্টা হেমাঙ্গদার। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পর কলকাতায় হেমাঙ্গদার সাথে কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে চল্লিশের দশকের মত উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিমন্ডল তিনি পাননি – যে পরিবেশে একটি সংগঠিত আন্দোলনে অংশীদার হয়ে গণসঙ্গীতের বিকাশে তিনি আরও অবদান রাখতে পারতেন। বিভাজন ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টিতে, গণনাট্য সংঘে। মতাদর্শের সংঘাত শিল্পীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে তিক্ততা। দলীয় সংকীর্ণতা, শিল্পীদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পবিবেশকে করেছে কলুষিত। কিন্তু সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জনগণের কবি হেমাঙ্গদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিলেন গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের ধারাকে, জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও সংগ্রামে বার বার আলোড়িত হয়েছেন তিনি। ১৯৪৭–এ যে স্বাধীনতা এল সেই স্বাধীনতায় জনগণ উপকৃত হয়নি; বরং তাদের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র বাড়তেই লাগল, তাদের উপর চলতে লাগল কঠোর নির্যাতন ও শোষণ, অন্যদিকে ভারত পকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে ধনিক–বণিক গোষ্ঠীর পোয়াবারো হলো, এই গোষ্ঠীরই রাজত্ব কায়েম হলো বৃটিশরাজের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে। দেশবিভাগের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল, লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দেশের মাটি থেকে উৎখাত হ'ল। হেমাঙ্গদা নিজেও দেশবিভাগের ফলে সিলেটের মাটির সাথে সম্পর্ক হারালেন। বিকৃত স্বাধীনতা আর দেশবিভাগের যন্ত্রণায় অস্থির কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখলেন দীর্ঘ এক ব্যঙ্গাত্মক কাব্যগান ব্যাটেনের ভারত ত্যাগের সময় এই গানটি লেখা হয়। গানটি শুরু হয়েছে এইভাবে –

"মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব ও

তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলায় ও"

দেশ বিভাগের প্রত্যক্ষ বলি যারা হয়েছে তাদের বেদনা চমৎকারভাবে গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে –

"হিন্দুস্থানে শ্বশুর বাড়ি পকিস্তানে ঘর
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর"

স্বাধীনতার স্বরূপকে এই গানে নান ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন–

"রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ
লেজের আগুন দিয়া সোনার লঙ্কা করে ধ্বংস
(আহা মরি মরি)
ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রণ বুঝিলাম অবেলা
রাজভোগ খাওয়াবো কইয়া খাওয়াইলো কাঁচাকলা।"

আমাদের এই বাংলাদেশের সাথে হেমাঙ্গদার নাড়ীর টান, এখানকার সুরমা, মেঘনা, পদ্মা নদীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা এতই গভীর যে এই দেশ, মাটি ও নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার তীব্র বেদনা করুণ কান্নার সুরে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর একাধিক গানে :

"আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা
দরদীরে মন কান্দে পদ্মার পাড়ের লাইগ্যা
আমার শান্তির গৃহ, সুখের স্বপনকে
দরদী কে দিল ভাঙিয়া।।
পানিতে কান্দে, পানি খাউরি
শুকনাতে কান্দে টিয়া
আমার অভাইগ্যার অন্তর কান্দেরে পোড়া দেশের লাগিয়া।"

এই কান্না, এই বেদনা তাঁর একার নয়। বহুজনের বেদনাকেই তিনি তাঁর গানের ভাষায় মূর্ত করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, জনগণের গৌরবদীপ্ত সংগ্রাম হেমাঙ্গদাকে নাড়া দিত প্রচন্ডভাবে। ১৯৫২–তে এদেশে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি দারুণভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারীতে রক্তপাত ও হত্যায় তিনি যেমন ক্ষুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন তেমনি ছাত্র–জনতার সাহসী লড়াই ও আত্মদানে তিনি অসীম গর্ব অনুভব করেছেন। তাঁর লেখনী থেকে সৃষ্টি চমৎকার একটি গানের অংশবিশেষ এমনি–

"শোন দেশের ভাই ভগিনী,
শোন আচানক কাহিনী
কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে।।
ও ভাইরে ভাই – ছিল বুড়ি গঙ্গার মরাপানি,
তার বুকেতে আনলো জোয়ানীরে
কার কইলজার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুচরে।"

হেমাঙ্গদার পরবর্তী সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে আমি মনে করি তিনি ঐ যুগে গণনাট্য আন্দোলনে যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন–যত গান, যত কবিতা লিখেছেন তাতেই তাঁর জীবন সার্থক। তাঁর অবদান শুধু সিলেটের গণনাট্য আন্দোলনকেই সমৃদ্ধ করেনি, সমৃদ্ধ করেছে সারা বাংলা ও আসামের আন্দোলনকে, তাঁর গান ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও প্রভাবিত করেছে সারা ভারতের গণসঙ্গীতের ধারাকে।

[কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'খনক' হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণ সংখ্যা ১ ম খন্ডে লেখাটি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে]

শহীদ শিক্ষক নূরুল আমিন

১৯৭১-এর ২৩শে এপ্রিল আমার স্কুলের শিক্ষক নূরুল আমিন মাত্র ২৯ বছর বয়সে বর্বর পাকিস্তানী সেনার নিষ্ঠুর ছোবলে নিহত হন। তাঁর রক্তাক্ত লাশ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। গুলিবিদ্ধ বিকৃত ঐ রক্তমাখা লাশের চেহারা কল্পনা করতেও আমি শিউরে উঠি। কিন্তু আজ এই লাশকে নিয়েই আমি লিখতে বসেছি, লিখছি তাঁর জীবনের মহত্ত্ব ও মৃত্যুর গৌরবকে অক্ষয়, অমর করে রাখার জন্য। এই লেখার কাজটা আমার জন্য খুব সহজ নয়। নূরুল আমিন ছিলেন আমার অতি আপন জন, আপন ছোট ভাইয়ের মত। আমরা স্কুলের সব শিক্ষক শিক্ষিকাই ছিলাম এক পরিবারভুক্ত সদস্যের মত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। তাছাড়া নূরুল আমিনের নিজস্ব একটা ক্ষমতা ছিল অন্যকে সহজে আপন করার ও আকৃষ্ট করার। এমন এক প্রিয়জন যাঁকে ঘাতকেরা নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। তাঁকে নিয়ে লেখা বড়ই কঠিন। লিখতে গিয়ে আমার কলম থমকে দাঁড়াচ্ছে, চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আবেগের প্রাবল্যকে দমন করতে গিয়ে অনুভব করছি অব্যক্ত এক যন্ত্রণা।

আমি ফিরে যাচ্ছি উনিশ বছর আগেকার দিনগুলোতে যখন নূরুল আমিন জীবিত। আমার চোখের দৃষ্টিতে, মনের পর্দায় বার বার ভেসে উঠছে সেদিনকার নূরুল আমিনের ছবি, তারুণ্যের উচ্ছলতা ও প্রাণবন্ততায় উজ্জ্বল আমার সেই শহীদ ভাইটির জীবন্ত রূপ। সবল সুঠাম দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, গায়ের রং কালো, মাথার চুলগুলো কদমছাটের মত ছোটছোট করে ছাটা, মুখে মিষ্টি হাসি সারাক্ষণ কর্মচঞ্চল, যৌবনের গতিবেগে উচ্ছল এক উদ্যমী পুরুষের প্রতিচ্ছবি। গায়ের কালো বর্ণ এবং অতি সাধারণ চেহারা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের উদার্য ও গভীর সংবেদনশীলতার অভিব্যক্তি তার চেহারায় সৃষ্টি করেছিল ভিন্ন এক সৌষ্ঠব।

নূরুল আমিন অত্যন্ত মিশুকে স্বভাবের ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সবার সাথেই তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর মার্জিত রুচির প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি সব ক্ষেত্রেই । তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত মার্জিত, তাঁকে কখনও রেগে উচ্চকণ্ঠে কারো সঙ্গে কথা বলতে কিম্বা অবাঞ্ছিত, রুচি-বিবর্জিত শব্দ ব্যবহার করতে দেখিনি। কখনও রাগ করলেও কণ্ঠস্বর ও ভাষার ওপর আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল তাঁর, এমনকি

ছাত্রীদের শাসন করার বেলাতেও তাঁর ঐ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেছে। মানুষের সাথে আচার-আচরণেও তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। বড়দের প্রতি আচরণে তিনি যেমন অত্যন্ত বিনয়ী নম্র-ভদ্র ও শ্রদ্ধাবনত ছিলেন তেমনি ছোটদের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর স্নেহশীল। তার সুরুচির ছাপ ছিল পোশাক-পরিচ্ছদেও। এব্যাপারে তিনি যেমন অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন তেমনি নির্লিপ্তও ছিলেন। তিনি সবসময় পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, রুচিসম্মত পোশাক ব্যবহার করতেন, যা তার শিক্ষকতা পেশার সাথে ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষক হিসেবেও নূরুল আমিন অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তার পারদর্শিতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। নিষ্ঠা, উদ্যম, কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তার পেশাগত বৈশিষ্ট্য। ঘন্টা বাজার সাথে সাথে বড় বড় পা ফেলে ক্লাশের দিকে ছুটতেন দ্রুত গতিতে। তাঁর চলার ভঙ্গিটাই ছিল এরকম। আলস্যের ভাব, ফাঁকি বা শৈথিল্যের প্রবণতা কখনও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করিনি। তিনি ছিলেন অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা ঐ বিষয়গুলোকে ভয় করে এবং সাথে সাথে ঐ বিষয়ের শিক্ষককেও। কিন্তু নূরুল আমিন ঐ ভীতি কাটাতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন এবং অনেকখানি সফলও হয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি ছাত্রীর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। শ্রেণীকক্ষে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে- কখনও ব্লাকবোর্ডের সামনে চক হাতে, কখনও এক বেঞ্চ থেকে আর এক বেঞ্চে ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করে কখনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, কখনও প্রশ্নোত্তরে গোটা ক্লাসটাকে তিনি জমিয়ে রাখতেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ সাবলীল, উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ, কণ্ঠস্বর ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান গুণ যেটি থাকা উচিত সেই গুণটি তাঁর ছিল। গুণটি হচ্ছে তাঁর হাসিখুশী ভাব। এই গুণের সাহায্যে তিনি ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন। কঠিন বিষয় পড়ানোর ফাঁকে মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করে অমনোযোগী ছাত্রীদের হকচকিয়ে দিতেন। কোন ছাত্রী একটানা কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকলে তিনি খুঁজে খুঁজে ছাত্রীটির বাড়ি গিয়ে হাজির হতেন, অভিভাবকের কাছে খবর নিতেন কি তার সমস্যা, অসুস্থ কিনা বা টাকা-পয়সার সমস্যা কিনা বা অন্য কিছু। কোন সমস্যার সমাধান আয়ত্তের মধ্যে থাকলে তিনি সেটা সামাধানেরও চেষ্টা করতেন।

মানুষ হিসেবে নূরুল আমিনের সবচাইতে বড় গুণ ছিল দেশের গরীব-দুঃস্থ খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য তাঁর গভীর মমত্ববোধ। এই গুণটির জন্যই তিনি তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন এবং যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকারে কখনও দ্বিধা করেননি। তিনি নিজে যা আয় করতেন স্কুলের বেতন ও প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে তার একটা অংশ তিনি বিলিয়ে দিতেন গরীব অভাবগ্রস্ত পাড়া প্রতিবেশী ও পরিচিত জনদের মধ্যে। কারো বাড়িতে খাবারের সংস্থান নেই, কোন ছাত্র টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারছেনা কিম্বা কারো পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে - এরকম সমস্যার

খবর পাওয়া মাত্র তিনি ছুটে যেতেন, নিজের যথাসাধ্য দিয়ে সাহায্য করতেন, কখনও অর্থ দিয়ে কখনও শ্রম দিয়ে, নিজের সামর্থে যখন কুলোতনা তখন খুব প্রয়োজন দাঁড়ালে ভাই-ভাবীদের সাহায্য চাইতেন। টাকার অভাবে যে সব ছাত্র প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারতোনা এমন কিছু কিছু পরিচিত ছাত্রকে বিনা পয়সায় তিনি প্রাইভেট পড়িয়েছেন। এভাবে নিজের শ্রম দিয়েও তিনি অনেককে সাহায্য করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন মানুষের সেবায় তাঁর আত্মনিবেদনের পরিচয় আমরা আরও বেশী মাত্রায় পেয়েছি। এই আত্মনিবেদন ছিল অসীম বীরত্বপূর্ণ ও পরম গৌরবের। নূরুল আমিন রাজনীতি করতেন না, কিন্তু রাজনীতি সচেতন ছিলেন। দেশ, দেশের মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন, বাঙালী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বাঙালী জাতিসত্তায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। বাঙালীজাতির মুক্তির আকাঙ্খা লালন করতেন তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীরে।

এবার ফিরে যাচ্ছি সেই প্রসঙ্গে যেখান থেকে নূরুল আমিনের জীবন শুরু হয়েছে। ১৯৪২-এর ১৫ই জানুয়ারী সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নূরুল আমিনের জন্ম হয়। তাঁর আব্বার নাম মোঃ গরীব হোসেন। তিনি একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। ১৯৬০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের নাম নুরুন্নেছা। ১৯৬৭-তে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। পাঁচভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে নূরুল আমিন ছিলেন পঞ্চম, তাঁর বড় তিনভাই ও এক বোন, ছোট চার বোন ও একভাই। তিনি ছাড়া আর সব ভাই বোন এখনও বেঁচে আছেন, তাঁরা সবাই বিবাহিত। নূরুল আমনিদের পৈতৃক বাড়ি চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত মতলব উপজেলার গজরা গ্রামে। ওঁদের বাড়িটি জুবলী বাড়ি নামে খ্যাত। তবে দেশের বাড়িতে কখনই তাঁরা স্থায়ীভাবে থাকেননি। ভাইবোন সবারই কাজকর্ম লেখাপড়া সবকিছু নারায়ণগঞ্জ শহরে হয়েছে। শহরের হাজিগঞ্জ এলাকার ২১নং বড়িটি (বর্তমানে ২৭, হাজিগঞ্জ) তাঁদের মায়ের সূত্রে পাওয়া। এ বাড়িতেই নূরুল আমিন ভাইবোনের সাথে একত্রে জীবন কাটিয়েছেন। সবকটি ছেলে-মেয়েকে মানুষ করা ও লেখাপড়া শেখানো তাঁর আব্বার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কাজেই ছেলেবেলা থেকে সংগ্রাম করেই তাঁদের লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। ১৯৫৯ সনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে নূরুল আমিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। এর মাত্র এক বছর পরই তার আব্বার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু তাঁদের জীবনে আরও বিপর্যয় ডেকে আনে। নূরুল আমিনের পড়াশুনা অব্যাহত গতিতে এগোতে পারেনি। ম্যাট্রিক পাশের সাত বছর পর ১৯৬৬তে নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ থেকে তিনি আই,এস,সি, পাশ করেন। আই,এস,সি পাশ করার পর পরই '৬৬এর ১১ই অক্টোবর তিনি আমাদের স্কুলে (নারায়ণগঞ্জ গার্লস্ হাই স্কুলে) শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। স্কুলের চাকরির পাশাপাশি তিনি প্রাইভেট টিউশনিও করতেন এবং গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী নেওয়ার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ছোট চারটি অবিবাহিত বোন ও একটি ভাইকে নিয়ে খুব

চিন্তা করতেন। বড় তিন ভাইয়ের সহায়তায় কিভাবে তাদের লেখা পড়া সমাপ্ত করা যায় এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যায় সে ব্যাপারে নূরুল আমিন সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে তাঁর ছোটবোন নূর আখতারকে আই,এস,সি পাশ করার পর ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে আমাদের স্কুলে চাকরি দেওয়া হয়। তাঁদের দশটি ভাইবোনের মধ্যে নিবিড় ভালবাসার বন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা আজও আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। এই বন্ধনকে দৃঢ় ও অটুট রাখার ক্ষেত্রে নূরুল আমিনের ছিল এক বিশেষ ভূমিকা।একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে নূরুল আমিনের মধ্যে দ্রুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানী শাসন থেকে মুক্তির জন্য বাঙালী জাতির দৃঢ় অঙ্গীকার ও জঙ্গী ঐক্য তাঁকে গভীরবাবে প্রভাবিত করেছিল। পরিবারেও তিনি তাঁর বড় ভগ্নিপতি বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও '৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত এম্. এন্. এ. গোলাম মোর্শেদ ফারুকীর রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর রক্তে তখন উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। ফারুকী সাহেবের সান্নিধ্য ও সাহচর্য নিঃসন্দেহে তাকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফারুকী সাহেব একজন নিষ্ঠাবান আওয়ামী লীগ নেতা, খাঁটি দেশপ্রেমিক, অত্যন্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। নূরুল আমিনের ওপর তার এই দুলাভাইটির ব্যক্তিগত প্রভাব বড় কম ছিলনা। এতকাল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও একাত্তরের মার্চে মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ণ প্রস্তুতি তিনি নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে তখন সবসময় একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। অনেক কথা খোলামেলা বলতেন আবার কিছু কথা চেপেও যেতেন। হয়ত গোপন প্রস্তুতির কথা বলতে চাইতেন না।

২৭শে মার্চ যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মারাত্মক অস্ত্রসম্ভারের বহর নিয়ে নারায়ণগঞ্জশহরের দিকে ধেয়ে আসছিল তখন তাদের গতিকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরের প্রবেশ মুখে চাষাড়া, জামতলায় যে সব মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রহাতে বীরের মত লড়াই করেছিল তাদের মধ্যে নূরুল আমিনও ছিলেন। এ সংবাদ আমি পেয়েছি অনেক পরে। ২৭শে মার্চ থেকে আমি সপরিবারে নারায়ণগঞ্জ শহরের মধ্যেই এক বাড়ী ছেড়ে আর এক বাড়িতে অনবরত পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। নূরুল আমিনের সাথে আর আমার দেখা নেই। এপ্রিল মাসের শুরুতে কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা আমার সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন বেতনের টাকার জন্য। সবারই টাকার প্রয়োজন। আমারও সংসার অচল হয়ে যাবে টাকা না পেলে। কিন্তু আমি তখন বড় অসহায় বোধ করছি। এমন কাউকে পাচ্ছিনা যে সাহস করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ও বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। আমার সহকারী প্রধান শিক্ষক মীজানুর রহমান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী (আমার স্কুলের শিক্ষিকা) রাজিয়া বেগম ছেলেমেয়ে সহ তখন বসন্তরোগে শয্যাশায়ী। এমনি এক সংকট মুহূর্তে ত্রাণকর্তার মত নূরুল আমিন সাহেব এসে হাজির হলেন আমার আস্তানায়। তাঁকে দেখে আমার সে কি আনন্দ আর মানসিক প্রশান্তি। তিনিই বেতনের টাকা তোলার সব ব্যবস্থা

করলেন এবং বিতরণের দায়িত্বও পালন করলেন। বসন্তরোগে শয্যাশায়ী মীজানুর সাহেব ও তার স্ত্রীর বেতন পৌঁছোতে গিয়ে দেখলেন তাদের দুর্দশার চিত্র। তাদের ওযুধ-পথ্য বাজার-হাটের ব্যবস্থা করলেন, স্কুলের দারোয়ানকে বলে গেলেন নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নেওয়া ও বাজার-হাট করার জন্য। এর পর থেকে তিনি নিজেই দু'একদিন অন্তর খোঁজখবর নিতে আসতেন, মীজানুর সাহেবদের দেখতে যেতেন এবং সম্ভবমত অন্যান্য শিক্ষকেরা সংবাদ নিতেন। যখন তখন দিনে-দুপুরে তিনি চলে আসতেন। আমার আস্তানা বদল হলেও তিনি তা খুঁজে বার করতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নারায়ণগঞ্জ শহরে আমার শেষ আস্তানা ছিল স্কুলের বিজ্ঞান গবেষণাগারে। এখানেই নূরুল আমিনের সাথে আমার শেষ দেখা। তিনি যে রকম বেপরোয়াভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতেন তাতে আমি রীতিমত আতঙ্ক বোধ করতাম। আমি তাকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলতাম, " দেখুন আপনাদের মত তরুণ বাঙালীদের ওপর হায়নাদের শ্যেন দৃষ্টি, তা ছাড়া আপনার চুল আর চেহারা দেখলে বিদ্রোহী পুলিশ বা ই.পি.আর-এর লোক বলে সহজেই সন্দেহ হতে পারে। কাজেই আপনি এত ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করবেন না।" তিনি হো হো করে হেসে তাঁর বিপদের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, " আপা, আমার জন্য চিন্তা করবেন না আমি দেখেশুনেই চলি । ভয় আর দুশ্চিন্তা আপনাদের জন্য। আপনাদের এখন চিহ্নিত করা হচ্ছে। আপনি চম্পা আর অসুস্থ দাদাকে নিয়ে দৌড়ে পালাতেও পারবেন না। মানসিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় আপনাদের খোঁজখবর নিতে না এসে পারিনা।"

নূরুল আমিন শুধু যে আমাদের খোঁজখবর নিতেন, প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন তাই নয়, তিনি ঐ সময়টায় ব্যস্ত ছিলেন অনেককে নিয়ে অনেক ধরনের কাজে। বিপন্ন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী পরিচিতজনদের আশ্রয়, নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর, টাকা-পয়সা, আহারের সংস্থান ইত্যাদি কাজে তিনি নিত্য তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ছুটে বেড়াতেন- গ্রাম থেকে শহরে ,শহর থেকে গ্রামে, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়। ২৭শে মার্চের পর নূরুল আমিনের বাড়ির সবাই দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তিনিও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে সেখানে আটকে রাখতে পারেননি। তিনি তখন অস্থির, চঞ্চল- বিশেষভাবে গরীব,দুঃস্থ, সহায়সম্বলহীন মানুষের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ও আহারের সংস্থানে নিজেকে তিনি নিয়োজিত রেখেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর পরিচিত পরিবারের যে সমস্ত ব্যক্তি পাকিস্তানী সৈন্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন সেই সব শহীদ পরিবারের শোকাকুল অসহায় পরিজনদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সান্ত্বনা ও সাহায্য দান করার কাজটিকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর একটা মস্তবড় উৎকণ্ঠা ছিল তাঁর বড়বোন (আওয়ামী লীগ নেতা ফারুকী সাহেবের স্ত্রী) ও তাঁদের সন্তানদের জন্য। পাকিস্তানীদের বর্বর গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই ফারুকী সাহেব একাই সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর পরিবার দেশেই থেকে

গিয়েছিলেন। তাঁদেরকে শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। নানা অভাব অসুবিধার মধ্যে তাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন। এর মধ্যে আবার তাঁদের একটি ছেলে (নূরুল আমিনের ভাগ্নে) অত্যন্ত অসতর্ক অবস্থায় ঘোরাফেরা করত। সে একটি চিহ্নিত শত্রুর সন্তান, কাজেই তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর দায়িত্ব নূরুল আমিন সাহেব নিজেই পালন করেছিলেন। সর্বশেষ নূরুল আমিন শহর ছেড়ে যাত্রা করলেন বড় বোনের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অত্যন্ত অসহায় জীব পোষা গরুগুলোকে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সাহায্যকারী মুটে মজুর ছিল। যাওয়ার আগে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। তাঁর একটা ইচ্ছা ছিল বড় বোনের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবেন। কিন্তু তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ফিরে এসে আবার তিনি আমার সাথে দেখা করবেন। আর তাঁর সাথে দেখা হয়নি। যেদিন তিনি বোনের জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে সঙ্গীসহ নারায়ণগঞ্জ ফিরে আসেন সেদিন তারিখটা ছিল ২৩শে এপ্রিল। সম্ভবত সময়টা তখন প্রায় দুপুর। শহরের কদমতলী ঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে তিনি একটা রিক্সায় চড়ে বসেছিলেন, পেছনে তাঁর সঙ্গীরা। রিক্সা চলতে না চলতেই সাক্ষাৎ যমদূতের মত তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়াল পাকিস্তানী হায়েনার দল। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। তিনি কি করেন, মুক্তিযোদ্ধা কিনা, কলেমা পড়তে জানেন কিনা, লেফ্‌ট-রাইট্ করতে পারেন কিনা ইত্যাদি। তিনি বার বার একটা কথাই বলার চেষ্টা করছিলেন তিনি একজন নিরীহ শিক্ষক। তাঁকে যখন আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তখন তাঁর সঙ্গীরা ছুটে চলে এসেছে তাঁর তাঁজিগঞ্জের বাড়িতে। মাত্র কয়দিন আগে নূরুল আমিনের সেজো ভাই নূরুল হোসেন (বাকুমিয়া) চাকরীতে যোগদানের নির্দেশ পেয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে এসেছিলেন। তিনি তখন একাই এখানে এসে ছিলেন। লঞ্চ ঘাট থেকে ছুটে এসে সঙ্গীরা যখন তাঁকে জানাল যে সৈন্যরা নূরুল আমিনকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তখন তিনি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কদমতলীর দিকে। উপস্থিত সবাই তাঁকে বাধা দিল তাঁর যাওয়াটা উচিত হবেনা ভেবে। তিনি তখন তাঁর অফিসের অবাঙালী এক কর্মচারীকে পাঠালেন সেখানে। সেই কর্মচারীটি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে গেলেন, " যদি তাঁকে গিয়ে জিন্দা পাই তাহলে আমি তাঁকে অবশ্যই ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।" কিন্তু তাঁকে আর জিন্দা পাওয়া যায়নি। তাঁর নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে কদমতলীর রক্তেভেজা মাটির উপর- এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন ঐ অবাঙালী কর্মচারীটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানালেন কোনও এক রাজাকার বা আলবদর নূরুল আমিনকে চিহ্নিত করে ঘাতকদের জানিয়েছে তিনি একজন আওয়ামী লীগের ও মুক্তিবাহিনীর লোক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক লক্ষ্য করে পরপর গুলি আর বেয়নেটের নির্মম আঘাতে ঘাতকেরা তাঁর সম্ভাবনাময় জীবনটাকে গুঁড়িয়ে দেয়। এই দুঃসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সেজোভাই

বাচ্চুমিয়া নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে যোগাযোগ করে এ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে লাশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতি ছাড়াই বাড়িতে জানাজার ব্যবস্থা করা হয় । সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকারে গলিপথ দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় মাজদাইর গোরস্থানে এবং সেখানেই নূরুল আমিনকে কবর দেওয়া হয়। ভাগ্য ভাল নূরুল অমিনের লাশ ভাইয়ের হাতে পড়েছে, দাফনের সব নিয়ম মানা সম্ভব হয়েছে, বহু শহীদের মত শেয়াল-কুকুরের হাতে পড়েনি, শকুনের খাদ্য হয়নি কিম্বা নদীর জলে ভেসে যায়নি। নূরুল আমিনের নিহত হওয়ার সংবাদ আমি সেদিন বিকেলেই পেয়েছিলাম। শোকাভিভূত হয়েও মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এই বলে- নূরুল আমিনের মৃত্যুতে কোন স্ত্রী বিধবা হয়নি, কোন সন্তান পিতৃহারা হয়নি, কোন পিতামাতা সন্তানহারা হননি, কাউকে তিনি অসহায় করে যাননি। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় তাঁর মৃত্যুতে ভাইবোন, আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্খী আমাদের সবার জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল দেশ ও সমাজের যে ক্ষতি হ'ল সেই শূন্যতা, সেই ক্ষতি পূরণ হবে কি করে?

বহু বছর পর মাত্র অল্প কয়দিন আগে গিয়েছিলাম তাঁর হাজিগঞ্জের বাড়িতে। দেখা হল সেজোভাই বাচ্চুমিয়া ও তাঁর স্ত্রী সেলিনার সাথে। নূরুল অমিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেজোভাই আর কান্না চাপতে পারেননি। উনিশবছর পার হয়ে গেলেও এই ভাইটির স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননা, ভুলতে পারেননা সেই ভয়াবহ দৃশ্য। ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত রক্তলাল লাশের দৃশ্য, ভূলতে পারেননা সেই অসহনীয় শোক ও যন্ত্রণার দিনটির কথা। সেজোভাইয়ের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম এই ভাইটির জন্য তাঁরা কতটা গর্ব অনুভব করেন। নূরুল আমিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যে বৈশিষ্ট্যের ওপর সবচাইতে জোর দিয়েছিলেন তা হ'ল সাধারণ গরীব দুঃস্থ মানুষের জন্য নূরুল আমিনের অসীম মমত্ববোধ, তাঁর গভীর দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভুমিকা। সেজোভাবী সেলিনা বিয়ের পর এ সংসারে এসে মাত্র এক বছর এই শহীদ দেবরটির সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন, তার সুন্দর মন ও মহৎ কাজের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দেবরের কথা বলতে বলতে সেলিনার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন সেখানে এসে হাজির হলেন নূরুল অমিনদের সবার বড় ভাই নূরুল ইসলাম। তিনি তাঁর ভাই সম্পর্কে একটি কথাই বললেন-" সে ছিল গরীব দুঃস্থ মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ, ছেলেবেলা থেকেই গরীব মানুষকে সাহায্য করার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। মানুষের জন্য এই মমত্ববোধ ছিল বলেই সে হতে পেরেছিল খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা।" নূরুল অমিনের সমস্ত খুঁটিনাটি কাগজপত্র, সার্টিফিকেট একটি ফাইলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছেন সেজোভাই তাঁর স্মৃতি হিসেবে। আমাকে দেখালেন সে ফাইলটি।

হাজিগঞ্জের বাড়িটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সামনে দালান কোঠা উঠেছে। কিন্তু পেছন দিকে যে টিনের ঘরটিতে নূরুল অমিন থাকতেন সেই ঘরটি এখনও অক্ষত রয়েছে। ঘরটি তালাবদ্ধ। সেই শূন্য ঘরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিষণ্ন হৃদয়ে ফিরে আসলাম সে বাড়ি থেকে। দু'ভাই ও ভাবী গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানালেন।

আমার ভাইপো
শহীদ শঙ্কু

শান্ত ধীর ছেলেটির বুকে দেশাত্মবোধের আগুন কখন কি ভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, কখন সে শোষিত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প নিয়েছিল এবং বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য, চাকরির মোহ, ব্যক্তি–স্বার্থ ত্যাগ করে মেহনতী মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে জীবনকে বিপ্লবী সংগ্রামে উৎসর্গ করার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা সে শেষপর্যন্ত পরিবারের কাউকে এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকেও জানতে দেয়নি। ছেলেটি বড় চাপা স্বভাবের ছিল, কথা বলত কম, গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষায় ছিল ওস্তাদ। দেখতে বেঁটে খাট না হলেও খুব একটা দীর্ঘকায় ছিলনা, গায়ের রং ছিল শ্যামলা, সুন্দর না হলেও চেহারায় ছিল অপূর্ব লালিত্য। ছেলেবেলাতেই চশমা নিতে হয়েছিল। ঐ চশমার কাঁচ ভেদ করে সর্বাগ্রে নজরে আসত তার বড় বড় দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। ঐ চোখের দৃষ্টি আর মুখের মিষ্টি হাসি দিয়ে সে সবার মন কেড়ে নিতে পারত। মনটা ছিল নীল আকাশের মতই উদার ও স্বচ্ছ। পরিবার ও আত্মীয়–স্বজন সবার জন্য ছিল তার গভীর মমত্ববোধ। অল্প বয়সেই সে ছিল অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তী জীবন যাপনে সে অভ্যস্ত ছিল। বিলাসিতার সুযোগ পেলেও বিলাসী জীবনকে সে সবসময় প্রত্যাখ্যান করত। খাওয়া–পরার ব্যাপারে কোন বিশেষ আব্দার ছিলনা। ব্যক্তিগত চাহিদা ছিল একেবারে ন্যূনতম। এই শান্ত সরোবরে যে একদিন ঝড় উঠবে, মনে জমাটবাঁধা বিক্ষোভ যে একদিন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিলাভা ঝরাবে এবং সেই জ্বলন্ত লাভায় সে নিজেই যে একদিন পুড়ে ছাই হয়ে আত্মবিসর্জনের মহান ইতিহাস রচনা করবে কে জানত!

ছেলেটি আমার বড় আদরের ভাইপো শঙ্কু, আমার সেজদা প্রবীণ বিপ্লবী সত্যব্রত দত্তের জ্যেষ্ঠ সন্তান। আমার সব ভাইপোর মধ্যে শঙ্কুই ছিল সর্বজ্যেষ্ঠ। ভাল নাম ছিল সুব্রত দত্ত। ১৯৪৪ সালের ৮ই অক্টোবর শঙ্কুর জন্ম হয় সিলেট শহরের মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে। তখন ঐ হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বিপ্লবী ডা. কল্যাণী দাস। এই মমতাময়ী বিপ্লবীর হাতেই শঙ্কু জন্ম নেয় এবং প্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। বাড়িতে একটি শিশু এলো কিন্তু বোঝাই যেতনা এ বাড়িতে একটা শিশু আছে। কোন কান্নাকাটি নেই, চুপচাপ খেলছে অথবা ঘুমোচ্ছে। এসময় ডিব্রুগড় থেকে পার্টির ডাক্তার

বিনয় চক্রবর্তী সিলেটে এসেছিলেন। তিনি প্রায়ই শঙ্কুকে দেখতে যেতেন। শিশুটি একদম চুপচাপ থাকে এই দেখে ডা. চক্রবর্তীর কেমন সন্দেহ হল। তিনি প্রশ্ন করেন, "ছেলেটি কাঁদেনা কেন বলত?" এই বলেই তিনি সজোরে এক চড় লাগালেন ওর গালে। শিশুটি ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। ডা. চক্রবর্তী খুশী হয়ে তাকে আদর করে. শান্ত করলেন এবং বললেন, "এবার থেকে দেখবে যেমন কাঁদবে তেমন হাসবে – চুপচাপ থাকবেনা।" পরবর্তী সময়ে তাকে কেউ কখনও কাঁদতে না দেখলেও দেশের দুঃখী মানুষের যন্ত্রণায় তার রক্তাক্ত অন্তরে যে কান্না জমাট বেঁধেছিল তাই একদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে ঝরে পড়েছিল। হাসি ছিল তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। বাইরে থেকে চুপচাপ মনে হলেও নীরবে সে কথার মালা গেঁথে চলেছিল বিপ্লবের মহান আদর্শকে সামনে রেখে। সেই কথাকে অনুসরণ করেই সে গড়ে তুলেছিল নিরলস কর্মময় এক বিপ্লবী জীবন। কথা বলত বৈকি, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও নয়।

শঙ্কুর জন্মের পনের দিন আগেই আমাদের পরিবারে আর একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। আমার তরুদা–রবীন্দ্র দত্তের বড় মেয়ে রসু হ'ল সেই শিশু। ভাইঝিদের মধ্যে রসুই সবার বড়। দত্ত পরিবারে এই প্রজন্মের প্রথম শিশু দু'টির আগমন যতই না আনন্দের বিষয়, কিন্তু পরিবারের বড় দুঃসময়ে ওদের জন্ম হয়েছিল। আমার বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তার রোজগার বন্ধ। আমরা ভাইবোনেরা পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সামান্য ভাতার সাহায্যে দিন গুজরান করছি। শঙ্কুর বাবা আমার সেজদা তখন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক, কাজেই আর্থোপার্জনের বিষয়টি তখন চিন্তার মধ্যেই ছিলনা। তাই তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে তখন আমাদের পরিবার জর্জরিত। বৌদি দু'জন পার্টি সদস্য হওয়ায় তারা অবশ্য হাসিমুখেই এই কষ্ট মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অবুঝ শিশু দু'টিকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঝড়–ঝাপটার হাত থেকে তাদের নিস্কৃতি দেবার কোন উপায় ছিল না। ফলে ওদের থাকার জায়গারই কোন স্থিতি ছিলনা, তাদের নিয়ে অনবরত টানা হ্যাঁচড়া করতে হয়েছে। ওরা কখনও থেকেছে আমাদের সিলেট বাসায়, কখনও মামাবাড়ি কখনও বা নরপতি আমাদের গ্রামের বাড়িতে। কথা শেখার পর শঙ্কু কিন্তু বেশ কথা বলত, তবে চীৎকার চেঁচামেচি বা কোন বায়না করত না। কিছু কিছু দুষ্টুমিও করত তবে চালাক ছেলের মত দুষ্টুমিটা করত খুব নীরবে, কেউ যাতে দেখতে না পায়। একদিন ব্লেড নিয়ে একা একা খেলা করতে করতে ওর ১৫দিনের বড় বোন রমুর কাছে এসে ধীরে ধীরে ওর হাতে ব্লেড বসিয়ে দিয়ে রক্তপাত ঘটাল। রমুর কান্না ও নালিশ শুনে বোঝা গেল শঙ্কুই আসামী। রক্ত দেখে রমুর কান্না ও বড়দের বকুনি শুনে ও অপ্রস্তুত হয়ে রমুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।মনে হচ্ছিল এখন ও রমুর দুঃখে বড়ই দুঃখী। শঙ্কু নেই কিন্তু শঙ্কুর ভালবাসার চিহ্ন এখনও রমুর হাতে অক্ষয় হয়ে আছে।

সেজদার জীবনে কিছুটা স্থিতি আসতে বহু বছর লেগেছিল। সম্পাদকের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব ছাড়ার পর কখনও অস্থায়ী চাকরী, কখনও বেকার, এক জায়গা থেকে আর এক

জায়গা চাকুরী–বদল– প্রথমে সিলেট, সেখান থেকে ঢাকায়, ঢাকা থেকে শিলচর, তারপর কোলকাতা হয়ে দিল্লী। এভাবে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩তে দিল্লীর হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সাব–এডিটরের চাকুরী গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সেজদা কখনও স্থায়ী হয়ে সংসার পাততে পারেনি। অথচ ইতিমধ্যে সে ৬টি সন্তানের জনক হয়েছে। কাজেই সন্তান–সন্ততি নিয়ে জীবন চলছে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে ছেলেদের লেখাপড়াও একটানা একটি জায়গায় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শঙ্কু ও তার ছোট শিবু দুজনেরই বিদ্যারম্ভ হয় শিলচর অম্বিকাপট্টি পাঠশালায়। পরে ওরা ওদের দিদিমার সাথে চলে যায় কোলকাতায় এবং সেখানে কালিধন ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি হয়। কোলকাতায় দিদিমার বাড়ি যতদিন ছিল ওরা, ওদের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওদের সেজমামা হীরালাল চৌধুরী। ১৯৫৪–এর পর শঙ্কু শিবু দিল্লীতে মা বাবার কাছে চলে যায় এবং ১৯৫৫–তে ওখানকার রাইসিনা বেঙ্গলী স্কুলে ভর্তি হয়। ১৯৬০ সালে শঙ্কু দিল্লী বোর্ড থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ওর সেজমামার আগ্রহে আবার পড়াশুনার জন্য ওকে কোলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোলকাতায় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বি.এস.সি ক্লাশে সে ভর্তি হয়। এক বছর এখানে থেকে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করার পর সে বোর্ড অব এপ্রেন্টিস ট্রেনিং (বি.ও.এ.টি.) এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং– এর সুযোগ লাভ করার ফলে বি.এস.সি. পড়া বন্ধ করে দিতে হয়। বি.ও.এ.টি পরীক্ষায় ভাল ফল করায় সে 'গেস্ট, কিন, উইলিয়ামস'– এ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ পায়। ১৯৬৬–তে সে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা অর্জন করে এবং হাওড়ার শালিমারে অবস্থিত বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা গেস্ট, কীন, উইলিয়াম্‌সেই স্থায়ী চাকুরীতে নিযুক্ত হয়।

কোলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকেই শঙ্কু শোযিত মানুষের মুক্তির অন্বেষায় বইপত্র পড়তে শুরু করে। বাইরে থেকে কখনও বোঝাই যায়নি যে রাজনীতি নিয়ে সে এত ভাবছে। এটা ঠিক পরিবারে বাবা, জ্যেঠা, কাকা এবং মা, ধনমামা এদের রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব এসব ছেলেমেয়েদের উপর পড়েছিল কিন্তু শঙ্কু যে এতটা গুরুত্বসহকারে সক্রিয় রাজনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা অনুমান করা যায়নি। এ সময় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সে জাড়িত ছিল, দক্ষিণ কোলকাতা ফিল্ম ক্লাবের সম্পাদক ছিল এবং পাঠচক্র ইত্যাদি সংগঠিত করেছিল– অবশ্য ১৯৬৪–তে বন্দী মুক্তি আন্দোলনে কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৬৪–তেই কমিউনিস্ট সংগঠনে দেখা দিল বিভাজন, সি.পি.আই. (এম) এর জন্ম হ'ল– আমার দাদারা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিলেন। বাড়িতেই বিতর্কের ঝড় উঠল এবং এই বিতর্কে সামিল হ'ল শঙ্কুসহ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

১৯৬৭–তে উত্তরবঙ্গের নক্সালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে কোলকাতার ছাত্র–যুবকদের এক বিরাট অংশ বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। এদের

মধ্যে ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, মেধাবী ছাত্ররা, তাজা প্রাণের ফুটন্ত গোলাপেরা। পরোয়া করেনি তারা জীবনের, তুচ্ছ জ্ঞান করেছে পরিবারের সুখের নীড় ও মা বাবার স্নেহবন্ধন, ডিগ্রী ও চাকরির মোহ ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই বিদ্রোহের দাবানলে। সেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে অনেকেই, সরকারী ও প্রতিপক্ষের নির্যাতনে দগ্ধ হয়েছে বহু। কিন্তু তারা তখন সমাজ বিপ্লবের নতুন পথ আবিষ্কারের নেশায় আবেগাপ্লুত। মাওসেতুং-এর চিন্তাধারা, লিনপিআওয়ের মতবাদ, নক্সালবাড়ির বিদ্রোহ তথা চীনা নেতৃত্বের প্রদর্শিত বিপ্লবের নতুন পথে তখন তাদেকে ভারতে সশস্ত্র শ্রেণীবিপ্লবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। শংঙ্কু কিন্তু তখনও সংযত। তাকে উত্তেজিত হতে বা আবেগে ভেসে যেতে দেখা যায়নি। অবশ্য গোপনে সে তাত্ত্বিক আলোচনা ও মতাদর্শগত সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছিল। নক্সালবাড়ির ঘটনা ও সি.পি.এম.এল.- এর জন্মের আগে থেকেই কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন গোপন গ্রুপের সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের ঘটনার সাথে জড়িত প্রধান সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী অনন্ত সিংকে কেন্দ্র করে এমনি একটি গ্রুপ ছিল। এই গ্রুপে শঙ্কু যোগ দেয়। এ সময়ে ভাইবোনদের মধ্যে একমাত্র ওর পিসতুতো দাদা (আমার বোনপো) মিঠুই ওর কাজের সাথে যুক্ত ছিল এবং বলা চলে মিঠু তাকে এ কাজে উৎসাহিতও করেছে। মিঠু ছাড়া পরিবারের আর কেউ শঙ্কুর এসব গোপন রাজনৈতিক তৎপরতার বিষয় কিছুই জানতনা। শঙ্কুর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, নেতার কথা বেদবাক্য বলে মনে করতনা সে এবং কারো কথায় অন্ধভাবে পরিচালিত হতে চাইতনা। নিজস্ব যুক্তি দাঁড় না করানো পর্যন্ত কোন মত সে মেনে নিতে পারতনা। সংশয় দেখা দিলে সেই মত পরিত্যাগ করতে সে দ্বিধা করতনা। এসব কথা তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছ থেকেই শোনা।

'Man-Money-gun' গ্রুপের কার্যকলাপ ও মতাদর্শে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একসময়ে সে ঐ গ্রুপ ছেড়ে দেয়। একা নয়, দলবল নিয়েই সে অন্য রাস্তায় চলে যায়। সে বিশ্বাস করত জনগণকে বাদ দিয়ে কোন কিছু হওয়ার নয়। '৬৬ তে চাকুরীতে যোগদানের পর সে হাওড়ার শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ শুরু করে। সেখানে পাঠচক্র গড়ে তুলে শ্রমিকদের মধ্যে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও মাওসেতুং-এর চিন্তাধারা প্রচারে ব্রতী হয়। দু'বৎসর চাকুরী করার পর ৬৮-তে সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মীর জীবনকে বেছে নেয়। তার চাকুরী ছাড়ার খবরও মিঠু ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। এমনকি তার ছোটভাই শিবু একই বাড়িতে থেকে পড়াশোনা ও ছাত্ররাজনীতি করছিল। অথচ শিবুও কিছুই আঁচ করতে পারেনি। বাড়িতে তার বৃদ্ধা দিদিমা ও অসুস্থ মামামনি ছিলেন। তাদের পক্ষে বিষয়টা অনুমান করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কারণ সে তার দৈনিক রুটিন একই ভাবে অনুসরণ করছিল এবং বাড়ির দায়িত্ব পালনে তার কোথাও ঘাটতি ছিলনা।ঠিক আগের নিয়মে ভোরবেলা স্নান করে খেয়ে সঙ্গে টিফিন নিয়ে আফিস যাওয়ার সময়েই বেরিয়ে যেত আবার অফিস শেষে প্রতি শনিবার পটলডাঙ্গায় বাকুর বাড়িতে যাওয়ার যে নিয়ম ছিল

সেই নিয়মও সে যথারীতি রক্ষা করছিল। বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফিরে যেত। কাজেই কারো মনে সন্দেহ জাগার কোন কারণই সে ঘটতে দেয়নি।১৯৬৯-তে সি.পি.আই. (এম.এল) গঠিত হওয়ার পর শঙ্কু তার দলবলসহ সেই পার্টিতে যোগদান করে। পার্টি অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিরোধ চলতেই থাকে। বিশিষ্ট নেতা সত্যনারায়ণ সিংহের মতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সরোজ দত্তের নির্দেশে শঙ্কু তার কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে বিহারের গ্রামাঞ্চলে গরীব, ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মধ্যে কাজ করতে চলে যায়। বিহারে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পরই কেবল জানা যায় তার চাকুরী ছাড়া ও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার খবর। আত্মগোপন অবস্থায় কোলকাতা বা দিল্লী গিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও মা-বাবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক। কাজেই পারিবারিক যোগাযোগটা হয়ে যায় খুবই ক্ষীণ ও দীর্ঘ দিন অন্তর অন্তর। শঙ্কু একাত্ম হয়ে যায় গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জীবনের সাথে। ওদের বাড়িতেই জীবনের অবশিষ্ট পাঁচ বছর কাটিয়েছে। ওদের অন্ন জুটলে ওরও জুটেছে, না হলে নয়। খাবার যা জুটেছে তাই সন্তোষের সাথে খেয়েছে, ঘুমিয়েছে ছেড়াকাঁথায় ভুমিশয্যায়। বাড়ি থেকে টাকা পয়সা বা জামাকাপড় কোন কিছুই সে দাবী করেনি, নেয়ওনি। বরাবরই শঙ্কুর জীবন ছিল আড়ম্বরহীন, সাদাসিধে। বেশভুষার প্রাচুর্য, খাওয়া-দাওয়ার বিলাসিতা কিছুই তার ছিলনা। তার মামারা যথেষ্ট সচ্ছল হলেও কখনও তাদের কাছে হাত পেতে কিছু চায়নি। তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া তার পক্ষে সহজতর হয়েছিল। এমন কষ্টের ও কৃচ্ছ্রতার জীবনকে সে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্নকে সফল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। সে চেয়েছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, শোষণ-মুক্ত এক সমাজ গড়তে। কাজের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে সে সি.পি.আই. (এম. এল.) এর বিহার রাজ্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। বিহারের গ্রামের ভিত্তিকে শক্ত করার পাশাপাশি সে বিহার ছাড়িয়ে মধ্য প্রদেশের গ্রামেও যাতায়াত শুরু করেছিল। আত্মগোপন অবস্থায় শঙ্কুর টেক্ নাম ছিল জহর। 'জহর' শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এরমধ্যে দুটো অর্থ তার চরিত্র ও ব্রতের সাথে হুবহু মিলে যায়। একটি অর্থ হচ্ছে 'মণি', আসলেই মানুষ হিসাবে সে ছিল এক সাচ্চামণি, আর একটি অর্থ হ'ল রাজপুত নারীদের অগ্নিকুন্ডে বা বিষপানাদি দ্বারা প্রাণবিসর্জনরূপ ব্রত। সত্যিই তার আদর্শের জন্য সে প্রাণ বিসর্জনের ব্রতই পালন করেছিল।

শঙ্কুর এক সহযোদ্ধার ভাষায়-"শঙ্কু ছিল অত্যন্ত Methodical। সময়ের অপচয় সে করতনা, প্রতিটি মূহূর্তের সদ্ব্যবহারে সে সচেষ্ট ছিল। টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। অল্প কথায় সে নিজেকে প্রকাশ করত।সাধারণ মানুষের জন্য তার অনুভূতি ছিল খুবই তীব্র। তার জীবনাচরণ ও সংবেদনশীল মন দিয়ে সে জয় করে নিয়েছিল গরীব আদিবাসী কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অন্তর। তারা তাকে পরিবারের

অতি আপনজন হিসাবেই গ্রহণ করতে পেরেছিল। কারো সাথে মতের অমিল হলেও সে এমন কোন ভাষা ব্যবহার করতনা যাতে ঐ ব্যক্তিটি আহত ও অপমানিত বোধ করতে পারে। গোপনীয়তা রক্ষায় সে ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার।”

কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যে তার কি পরিমাণ ছিল তার একটি বিবরণ শুনেছি ওর কাকীমার মুখে। একবার শঙ্কু ও মিঠু একটা রাজনৈতিক কাজে ট্যাক্সি চালিয়ে কোলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ট্যাক্সি ও চালক উভয়েরই কোন বৈধ কাগজপত্র ছিলনা। পথে হ'ল দুর্ঘটনা। দুজনেই আহত হয়ে সোজা হাসপাতালে চলে গেল। শঙ্কু তখন তালিকাভুক্ত আসামী। শঙ্কু মিঠুকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে কাকীমাকে ফোন করে তাড়াতাড়ি আসতে বল্ল। কাকীমা ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে দেখে শঙ্কু নিজেকে আড়াল করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কাকীমা মিঠুকে দেখে এসে শঙ্কুর দিকে তাকিয়ে দেখেন ওর অবস্থা মিঠুর চাইতেও খারাপ। অথচ ওর মুখে কষ্টের লেশমাত্র নেই। ও উদ্বিগ্ন মিঠুর জন্য। শঙ্কু হাসপাতালে ভর্তি হয়নি নিরাপত্তার কারণে, কিন্তু ওর চিকিৎসায় আর দেরী করা চলেনা। ওর কাকীমা তখন ওকে জোর করে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যায় এবং বাড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ওর কাকীমা বিস্ময়ে হতবাক, কি করে শঙ্কু দীর্ঘ কতগুলো ঘন্টা দুর্ঘটনার আঘাত নীরবে সহ্য করেছিল।

Disciplined জীবন যাপনে ও সময়ের সদ্ব্যবহারে শঙ্কু অভ্যস্ত হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই। কারখানায় এপ্রেন্টিস্‌শীপ ও স্কুলে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া একসাথে শুরু করায় শঙ্কু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় স্নানাহার, কারখানায় যাতায়াত, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে যাতায়াতের কাজ সেরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতি শনিবার কারখানা শেষে পটলডাঙ্গায় কাকুর বাড়ি যাওয়া ছিল তার নিয়মিত রুটিনের অঙ্গ। কাকু-কাকীমার আকর্ষণ ছাড়াও ঐ দিন সমস্ত জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাইদের সঙ্গে নিয়মিত মিলিত হওয়াটা ছিল একটা বড় আকর্ষণ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকত, বৃদ্ধা দিদিমা ও অসুস্থ মামামণির ওযুধ পথ্য দেওয়ার দায়িত্ব সেই পালন করত। বাড়ি ছেড়ে বিহারে চলে যাওয়ার আগে শিবুকে বাড়ির সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

শঙ্কুর জীবনে এলো সেই ভয়ংকর দিন। ১৯৭৫-এর ২৯শে নভেম্বর। বিহারের এক গ্রামের একটি বাড়িতে শঙ্কুদের সভা চলছিল। সাধারণত সভা চলাকালে ওদের একাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকত। প্রথমে বাচ্চাদের, এরপর মহিলাদের, এরপর পুরুষদের আরও দুটো বেষ্টনী থাকত। কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ওরা আগেই খবর পেয়ে যেত এবং পালাবার সুযোগ পেত। কিন্তু সেদিন পুলিশ ঘেরাও করে ফেলে গোটা গ্রাম এবং সমস্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী গুঁড়িয়ে দিয়ে সভাস্থলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময়। এসময় শঙ্কু বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলি এসে

বিদ্ধ হয় তার শরীরে। প্রাণবন্ত শঙ্কুর নিষ্প্রাণ লাশ পড়ে যায় মাটিতে। মাত্র ৩১ বছর বয়সে শঙ্কু এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে আমাদের সবার অন্তরকে শোকে বিদীর্ণ করে, সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে। পরিবারের লোকজন খবর পেয়েছে অনেক পরে পত্রিকায় ওদের প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে। সেজদা (শঙ্কুর বাবা) তখন বর্ধমানের জেলখানায়। সেও মাওসেতুং-এর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে সিপিএম্এল্ দলেই যোগ দিয়েছিল। ১৯৭১-এ যখন Hindustan Times পত্রিকায় Sub-Editor- এর পদথেকে সে Chief Sub-Editor-এর পদে উন্নীত হয় এবং তার বেতন অনেক বৃদ্ধি পায় ঠিক তখনই সে ঘর-বাড়ি পুত্র-কন্যা ছেড়ে চাকুরীর মায়া ত্যাগ করে গরীব কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ১৯৭৪-এ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং নির্মমভাবে প্রহৃত ও নির্যাতিত হয়। তারপর তার স্থান হয় বর্ধমান বন্দীনিবাসে। জেলে বসেই সে শঙ্কুর নিহত হওয়ার খবর পায়। শঙ্কুর মায়ের তখন চরম দুঃসময়। অর্থকষ্টের চাইতেও তার বেশী দুশ্চিন্তা ছিল তার স্বামী ও বড় ছেলেকে নিয়ে। চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসই ছিল তার সম্বল। সেজদার অনুপস্থিতিতে তাকে শঙ্কুর মৃত্যু সংবাদ জানাবার মত সাহস পরিবারের কারোর হয়নি। তাই সে খবরটা পেয়েছে আরও অনেক পরে সেজদার মুক্তির পর।

শঙ্কুরা বিপ্লবের যে পথ গ্রহণ করেছিল সেই পথ এবং মাওসেতুং তথা চীনা নেতৃত্বের মতবাদকে আমরা অনেকেই সমর্থন করিনি, বরং এর বিরোধিতা করেছিলাম। এপারে এবং ওপারে উভয় রাষ্টেই এমনকি সারা বিশ্বেই চীন-সোভিয়েট মতাদর্শগত বিরোধের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দেখা দিয়েছিল মস্ত ফাটল। এই ফাটল সারাবার কোন প্রয়াস ছিলনা- বরং বিভিন্ন মত ও পথের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের এতই অবনতি হয়েছিল যে পরস্পর পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছিল। আন্তঃপার্টি কলহের জের হিসাবে সংঘাত-হত্যা, খুন-জখমও কম হয়নি। দলীয় সংকীর্ণতা এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে পরস্পরকে কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করতেও অনেকের বাঁধেনি এবং অন্যের মত শোনা ও বিচার করার ধৈর্যও অনেকের ছিলনা। ভুল-শুদ্ধের বিতর্কের বাইরেও একটি সত্য সবাইকে মানতে হবে যে সবগুলো কমিউনিস্ট দলেই রয়েছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে স্থির, ত্যাগী, নিষ্ঠাবান ও সাহসী কর্মী ও নেতা। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মবলিদানের যোগ্য মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। শঙ্কুর মত যারা মানুষের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের মহান লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে তারা সবাই দলের উর্ধ্বে, সব শহীদের কাতারে তারা অন্যতম বীর শহীদ। শঙ্কুকে তাই জানাই শহীদের সম্মান। শঙ্কু আমাদের গৌরব।

ভুল-শুদ্ধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা , উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে চলে, সভ্যতা বিকশিত হয়। সমাজতন্ত্রের লড়াইও এভাবেই দেশে দেশে এগিয়ে যাবে চূড়ান্ত সাফল্যের

দিকে। ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু মিথ্যে হয়ে যায়নি তার স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যের বাণী, ইতিহাসের অগ্রগতিতে তার রয়েছে স্থায়ী অবদান। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের মধ্য দিয়ে তাদের ভ্রান্ত নীতি ও পথ উন্মোচিত হয়েছে কিন্তু ক্ষুন্ন হয়নি অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য, ব্যর্থ হয়নি বিশ্বপরিসরে তার অবদান, ব্যর্থ হয়নি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, আত্মত্যাগ ও গৌরবময় বিজয়। চীন ও তার অতীতের বহু ভুল স্বীকার করে নীতি ও পথ পাল্টেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে দেশে দেশে এগিয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রীরা, মানুষের মুক্তি-পিয়াসীরা, মানবতার কান্ডারীরা। সমাজতন্ত্রের কোন সুনির্দিষ্ট বা অভিন্ন মডেল নেই সত্য, কিন্তু তার মর্মবস্তু যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে তাদেরকে যারা অর্থবহ স্বাধীনতা চায়, শোষণ-মুক্ত , সমতা ও ন্যায় ভিত্তিক একটি সমাজ গড়তে চায়। কারণ সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির আর কোন বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এ উপমহাদেশে বৃটিশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরাও উজ্জীবিত করেছেন বহু সমাজতন্ত্রীকে। মাষ্টারদা সূর্য সেনের সন্ত্রাসবাদের পথ ভ্রান্ত বলে পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শ ও আত্মত্যাগের মহান গৌরব চিরঞ্জীব হযে আছে। ইতিহাসের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ সূর্য সেনের, সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদিরাম, তীতুমীর ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের। ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে যুগে যুগে অসংখ্য শহীদের রক্তধারায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শঙ্কুর আত্মদানও ব্যর্থ হবেনা। তার দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, সাহস, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের গৌরব সঞ্চারিত হবে আগামী দিনের মুক্তি-সংগ্রামীদের মাঝে। দেশ, কাল ও দলের উর্ধ্বে উঠে সে হয়ে থাকবে চিরঞ্জীব, চির অমর।

বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা স্মরণে

৯ সেপ্টেম্বর টিভির সংবাদে হঠাৎ করেই শুনতে পেলাম বাসন্তীদি কোলকাতায় এক নার্সিং হোমে সেদিনই সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঐ ছোট সংবাদটিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী হিসেবেই তাঁর পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বাসন্তীদির একটি অতিরিক্ত গৌরব ও মর্যাদার পরিচয়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব একটা পরিচয় রয়েছে, যে পরিচয়ের গুরুত্ব ও মহিমাকে কোনভাবেই খাটো করা চলেনা। এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য দেশপ্রেমিক মানুষের যে দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা যদি আজ আমরা স্মরণ না করি তাহলে শুধু যে তাঁর প্রতি আমরা অবিচার করব তাই নয় তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের ও প্রেরণা লাভের সুযোগ থেকেও আমরা নতুন প্রজন্মকে বঞ্চিত করব।

বাসন্তীদির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫৮ সনে। আমি তখন খুব বিপন্ন অবস্থায় সিলেট ছেড়ে ঢাকায় চাকরীর সন্ধানে, আশ্রয় নিয়েছি গেন্ডারিয়ায় আমার দিদির বাড়িতে। আমার দিদি পরিবারের সাথে আগে থেকেই বাসন্তীদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে দিদি, জামাইবাবু আমার চাকরীর ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করেছিলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন শুনলাম এক কথাতেই বাসন্তীদি আমাকে তাঁর স্কুলে চাকরি দিতে রাজি হয়ে গেছেন। কাজটা তাঁর জন্য খুব সহজ ছিলনা, বেশ ঝুঁকিপূর্ণই ছিল। আমি তখন সাধারণ একজন গ্র্যাজুয়েট, হাতে কোন সার্টিফিকেট ছিলনা, তার ওপর গায়ে আছে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের ছাপ, আছে সিলেট পুলিশের হুলিয়া। সব কিছু জেনেশুনেও বাসন্তীদি কি ভাবে আমাকে চাকরী দিতে সাহস করলেন এবং চাকুরী দেওয়ার পর কি ভাবে আমাকে সারাক্ষণ বিপদ থেকে আগলে রাখার জন্য প্রয়াসী ছিলেন তা যখন ভাবি, তখন তাঁর অসাধারণ কিছু গুণের কথা স্মরণ করে চমৎকৃত না হয়ে পারিনা। তাঁর ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মন। মানুষের দুঃখ-বিপদে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না এবং কোন বিপন্ন মানুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপরই তিনি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ছিল সংকল্পে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার দুরন্ত সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। তিনি ছিলেন ত্যাগী, নিবেদিত-প্রাণ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । তাঁর এসব

বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি নির্দ্বিধায় আমাকে তাঁর স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। স্কুলটির নাম ছিল গেন্ডারিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পরে তার নাম হয় মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

স্কুলটি ছিল বাসন্তীদির প্রাণ। অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে তিনি স্কুলটির পরিচর্যা করেছেন বড় যত্নের সাথে। সম্ভবত ১৯৪৪-এ স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা হিসেবে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। একটি বেসরকারী স্কুল গড়ে তোলা তখন মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। তাছাড়া '৪৭-এর দেশভাগ, '৫০ ও '৬৪-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগ প্রভৃতি নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায় স্কুলটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে বার বার। কিন্তু কঠিন দুঃসময়েও বাসন্তীদি মুষড়ে পড়েননি, শক্ত হাতে হাল ধরে স্কুলটিকে বাঁচিয়েছেন এবং বিকশিত করেছেন। বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের স্কুল ঘরেই আমার শিক্ষকতা জীবনের শুরু হয়েছিল। তারপর চোখের সামনেই তিন বছরের মধ্যে দেখলাম স্কুলের সম্প্রসারণ ও চেহারার নিত্যনতুন পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে দীর্ঘদিন। বাসন্তীদি তিলে তিলে স্কুলটিকে বড় করেছেন, টিনের ঘরগুলোকে পাল্টে দালান করেছেন, ফুলবাগান, টবের গাছ, সুন্দর আসবাব-পত্রে স্কুলকে মনের মত করে সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন এবং স্কুলে পড়াশুনার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টার পাশাপাশি চমৎকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলও গড়ে তুলেছেন। তার এসব কাজে যে দু'জনকে আমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে দেখেছি তাঁদের একজন হলেন তাঁর স্বামী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অন্যজন স্কুলের সেক্রেটারী ডা.ওয়াহেদ- অর্থ, জমিসংগ্রহ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন ডা. ওয়াহেদ। আর স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে, নাটকে, গানবাজনায়, অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় এবং ফুলবাগানের পরিচর্যায় জ্যোতির্ময় বাবুকে দেখেছি বাসন্তীদির পাশে দাঁড়িয়ে একসাথে কাজ করতে।

বাসন্তীদির প্রশাসনিক ধারা ছিল প্রচলিতধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রক্তচক্ষু দেখিয়ে বা জবরদস্তি করে কাজ আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। পুলিশের গোয়েন্দার মত সারাক্ষণ শিক্ষকদের পেছনে তিনি লেগে থাকতেন। তিনি নিজে কাজ করে অন্যদের কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারতেন, হেসে হেসে সবার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে জানতেন। আজকাল অনেক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নীচের ক্লাসে পাড়ানোটা অগৌরবের মনে করেন, অনেক প্রধান শিক্ষক নিজে কোন ক্লাসও করেননা। বাসন্তীদি তাঁর নিয়মিত ক্লাসের অতিরিক্ত ক্লাসও অনেক সময় নিতেন অনুপস্থিত শিক্ষকদের বদলে এবং ছোটদের ক্লাস নিতে তিনি বেশী পছন্দ করতেন। বাচ্চারা তাঁর ক্লাসে খুবই আনন্দ পেত। নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

শিক্ষকতা পেশার শুরুতেই বাসন্তীদির এই স্কুলে আমি পেয়েছি চমৎকার সুস্থ পরিবেশ। এখানে কাজ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি তেমনি ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সান্নিধ্যে

পেয়েছি গভীর পরিতৃপ্তি। স্কুলের ছাত্রী–শিক্ষক–কর্মচারী মিলিয়ে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ যেন একটি বিশাল পরিবার। এমন একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার মূল কৃতিত্ব ছিল বাসন্তীদির। অবশ্যই বাসন্তীদির সহায়ক শক্তি ছিলেন তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ও বিশেষভাবে সম্পাদক ডা. ওয়াহেদ। ওরা বাসন্তীদির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর সৃজনশীল কাজে সর্বদা উৎসাহ যুগিয়েছেন। তখনকার প্রবীণ–নবীন সব শিক্ষক–শিক্ষিকার মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও হৃদ্যতার নিবিড় সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রেও বাসন্তীদি ছিলেন প্রেরণার মূল উৎস। টিফিনের ঘন্টা বাজলেই তিনি চলে আসতেন শিক্ষিকাদের কমনরুমে। আমাদের সাথে বসে টিফিন খেতেন এবং স্বভাবসুলভ উচ্ছলতায় হাসি–গল্পে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। দাম্ভিকতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ কখনও লাগেনি তাঁর চরিত্রে। একজন প্রধানশিক্ষিকা যে তাঁর অধীনস্থ শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সাথে এরকম একাত্ম হয়ে মিশতে পারেন তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ছাত্রীদের তিনি ঠিক নিজের সন্তানের মত প্রয়োজনে শাসন করতেন, বকতেন আবার সীমাহীন স্নেহে তাদের অন্তরকে ভরিয়ে তুলতেন। পিছিয়ে–পড়া খারাপ ছাত্রীদের মধ্যে তিনি খুঁজতেন তাদের অন্য কি গুণ বা প্রতিভা আছে। কে গান জানে, কে ভাল আঁকতে পারে, কে সেলাইয়ে বা হাতের কাজে আগ্রহী ইত্যাদি জেনে নিয়ে তিনি তাদের সে সব কাজে উৎসাহিত করতেন। স্কুলে এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও ক্লাসের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সাধারণত আমাদের দেশে উপেক্ষিত হয়, কর্মস্থলে মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তাদের প্রতি বাসন্তীদির আচরণ ছিল অত্যন্ত মানবিক, পরস্পরের সম্পর্ক ছিল স্নেহ ও শ্রদ্ধা–ভালবাসার সমন্বিত তারে বাঁধা।

বাসন্তীদি ছিলেন সব ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি কখনও সংখ্যালঘুর হীনমন্যতায় ভোগেননি, নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করে দেখেননি। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’– এই চেতনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর মানুষ পরিচয় তুলে ধরে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব ছাত্রী–শিক্ষক–শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষকে আপন করতে পেরেছিলেন এবং নিজেও সবার শ্রদ্ধা–ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিলেন। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজের পরিচয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গভীর মমতায় তিনি মাতৃভূমির মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক হানাহানি, উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও তিনি বিচলিত হননি, কখনো দেশত্যাগের কথা ভাবেননি। এমনকি একাত্তরের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যদের অতর্কিত হামলায় যখন তাঁর সুখের সংসার তছনছ হয়ে গেল, চোখের সামনে যখন তিনি দেখলেন তাঁর স্বামীর গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ, আরও অনেক বাঙালীর লাশ ও রক্তের সাগর, তখনও তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেননি। অটুট মনোবল ও দুর্জয় সাহস নিয়ে মেয়েসহ নয়মাস

তিনি দেশের মাটিতেই কাটিয়ে ছিলেন প্রতি মুহূর্তে নিজের ও মেয়ের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

বাসন্তীদির রচিত 'একাত্তরের স্মৃতি' গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসে স্থান পাবে।বইটিতে আমরা ঐ এক শহীদের বিধবা স্ত্রীর কষ্টকর দিন যাপনের বাস্তব বর্ণনা, তেমনি বইয়ের অক্ষরগুলোর মাঝে নতুন করে আবিস্কার করি মানুষ বাসন্তীদিকে, খুঁজে পাই একটি শোকাহত মনের আড়ালে এক সাহসী নারীকে।

নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে প্রধানশিক্ষিকা হিসেবে চলে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল বাসন্তীদির সাথে যোগাযোগ ছিল খুবই শিথিল। স্বাধীনতার পর ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হওয়ার পর ঐ কমিশনে কাজ করতে গিয়ে আবার বাসন্তীদির সান্নিধ্য লাভ করি। তিনি ছিলেন ঐ শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত চার মৌলনীতির আলোকে প্রণীত এই ঐতিহাসিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বাসন্তীদির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারের কথা যাঁরা ভাবেন ও বলেন যাঁরা এর জন্য সংগ্রাম করেন তাঁরা কিছুতেই বাসন্তীদির এই অবদানের কথা ভুলে যেতে পারেননা। সমাজসেবী হিসেবেও বাসন্তীদির অবদান বড় কম নয়। বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী সৈন্য ও তার দোসরদের হাতে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজেও বাসন্তীদি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছিলেন।

চিকিৎসার জন্য কোলকাতায় যাওয়ার আগের দিন বাসন্তীদিকে দেখতে গিয়েছিলাম ঢাকার এক নার্সিং হোমে। কত যে খুশী হলেন তা তার রোগক্লিষ্ট মুখের হাসি দেখেই বোঝা গেল। ক্ষীণ স্বরে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করলেন, সবই পুরনো দিনের সুখ-স্মৃতির টুক্‌রো টুক্‌রো উচ্চারণ। আমার মনে ভেসে উঠল প্রথম দিনে দেখা সেই সতেজ সুন্দর তরুণী প্রধানশিক্ষিকার চেহারা। তিনি আমার হাত ধরে প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন ভাল হয়ে দেশে ফিরে আসবেন। চলে আসার সময় তাঁকে আশ্বস্ত করে বলে এসেছিলাম, আবার দেখা হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হলনা। সেদিনই তাঁর সাথে শেষ দেখা। প্রার্থনা এটাই, মৃত্যুর সাথে সাথে বাসন্তীদির সমস্ত কীর্তি ও অবদান যেন বিস্মৃতির অতলে ডুবে না যায়। তাঁর সুযোগ্য কন্যা দোলা, তাঁর অগণিত প্রাক্তন ছাত্রী, সহকর্মী ও তাঁর অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন এবং তাঁর আদর্শকে বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন এটাই আমার আশা। আমার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ দিয়ে প্রয়াত বাসন্তীদির প্রতি নিবেদন করছি আমার ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ।

[লেখাটি ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে দৈনিক 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

নানৃকার নেত্রী কালইবিবি

কালইবিবি বেঁচে আছে কি নেই, থাকলেও কোথায় আছে সে-সব খবর জানার চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। সম্ভবত ১৯৪৯-৫০এ নানকার আন্দোলনের সমাপ্তির মুখে পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও গ্রেফতারী পরোয়ানার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের অনেকের মত কালইবিবিও গ্রাম ছেড়ে আসামে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের জীবন থেকে সে চিরতরে হারিয়ে গেলেও আজও তার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি আমার মনে জীবন্ত হয়ে আছে। এই স্মৃতি কখনই বিবর্ণ হওয়ার নয়, ভুলে যাওয়ার মত নয়। দেশের মাটি তাকে ধরে রাখতে না পারলেও দেশের ইতিহাসে সে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে সিলেটের ঐতিহাসিক নান্‌কার আন্দোলনের অধ্যায়টিকে যেমন মুছে ফেলা যাবেনা তেমনি এই আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শহীদ নান্‌কারদের পাশাপাশি নান্‌কার মহিলা নেত্রী কালইবিবির নামও মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

অতি সাধারণ একটি নান্‌কার মেয়ে কালইবিবি। লেখাপড়া জানেনা,সম্পূর্ণ নিরক্ষর। জন্মসূত্রেই সে নান্‌কার এবং বংশ পরম্পরায় এদের পরিবার বর্বর নান্‌কার প্রথার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আসছিল। কালইবিবিও রেহাই পায়নি এই নিপ্পেষণের হাত থেকে। ইতিহাসে অমানবিক দাসপ্রথা ও ক্রীতদাসদের তীব্র যন্ত্রণার কাহিনীর সাথে আমরা পরিচিত। নান্‌কার প্রথা হচ্ছে দাস প্রথারই একটি বিশেষ সংস্করণ। লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক যুগের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় দাসপ্রথা চলে এসেছে এবং অটুট রয়েছে। অবশ্য কালপ্রবাহে বহিরঙ্গে এখানে ওখানে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই দাসপ্রথার সাথে নান্‌কার প্রথারও মৌলিক কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়না। তবে সিলেটে নান্‌কার প্রথার এই নামটি হল কবে থেকে সেটি একটি গবেষণার বিষয়। অনুমান করা হয় মোঘল আমলেই এই 'নান্‌কার' নামটি চালু হয়েছে। কারণ 'নান্' হচ্ছে একটি উর্দু শব্দ, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে রুটি এবং উর্দু ভাষা পাঠান মোঘল আমলেই সারা ভারতে বিস্তার লাভ করে। বিশেষভাবে মোঘল আমলেই ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার নানা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নামকরণে উর্দুর ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা হয়। মোঘল আমলের পর দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ শাসনকালে নান্‌কার প্রথা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত।

রুটির বিনিময়ে যে লোক রাখা হয় তাকেই নান্‌কার বলা হয়। তবে জমিদারী প্রথা চালু হওয়ার পর সরাসরি রুটি অর্থাৎ খোরাকী দেওয়া হতনা। খোরাকীর জন্য দেওয়া হত

দু'চার বিঘে জমি এবং বসতবাড়ির জন্য বরাদ্দ করা হত ছোট্ট একটি ভিটে। এই জমি-বাড়ির বিনিময়ে নান্‌কাররা পরিণত হত জমিদার, মিরালদার-তালুকদারদের বাঁধা গোলামে, নান্‌কার মেয়েরা দাসী-বাঁদীতে। তাদের শ্রমের কোন মূল্য নেই, কোন জুরি নেই, শ্রম ঘন্টারও কোন সীমারেখা নেই। জমিদারের হুকুমমাত্র তাদের ছুটে যেতে হত এবং হুকুম অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিনের চব্বিশ ঘন্টা, সারা মাস,বছর তাদের প্রস্তুত থাকতে হত। জমিদারের আদেশ মত কাজ করতে নান্‌কাররা ছিল বাধ্য, যদিও এই কাজের জন্য তারা কোন জুরি পেতনা। জমিদারদের সাংসারিক-পারিবারিক কাজ থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজেই নান্‌কারদের ব্যবহার করা হত। এমনকি তাদেরকে জমিদারের সমস্ত অন্যায়-জুলুমের কাজে- যেমন অন্য কৃষক-প্রজাদের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া,জমি দখল করা, দাঙ্গা, খুনোখুনি মেয়ে অপহরণ প্রভৃতি কাজে লাঠিয়াল হিসেবেও ব্যবহার করা হত। জমিদারের যে কোন হুকুম অমান্য করার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। কোন কৈফিয়ৎও সহ্য করা হতনা। নিজের বা পরিবারের কারো গুরুতর অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যা থাকলেও জমিদারের হুকুমে কাজে যেতেই হত। তা না হলে কপালে জুটত নানা ধরনের শাস্তি। বেতমারা, জুতোপেটা,হাত পা বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে বেতমারা,তক্তার নীচে শরীরটাকে ফেলে দু'পাশে চেপে চেপে নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের করা,লোহার শিক পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়া,বন্ধ ঘরে অনাহারে সপ্তাহকাল আটকে রাখা ইত্যাদি নারকীয় দন্ড তাদের দেওয়া হত। সবচাইতে মারাত্মক শাস্তি ছিল জমি-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাদেরকে সপরিবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। এমন ব্যবস্থা ছিল যে ভিটাচ্যুত শাস্তিপ্রাপ্ত কোন নান্‌কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্য কোন জমিদারের জমিতে আশ্রয় পেতনা। এ অবস্থায় তাকে পালিয়ে গোপনে আসামের কোন দূরবর্তী অঞ্চলে বা পার্বত্য ত্রিপুরায় অথবা অন্য কোন দূরের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে হত। আসলে নান্‌কারদের কোন স্বাধীনতাই ছিলনা। তাদের জীবন ও শ্রম শক্তির প্রকৃত মালিক ছিল জমিদার। জমিদারের মর্জির উপরই তাদের জীবনের চাকা আবর্তিত হত। জমি-বাড়ির উপর তাদের কোন স্বত্ব না থাকায় যখন খুশী তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা যেত। জমি ও বাড়ি বিক্রি, বন্ধক বা হস্তান্তরের কোন অধিকার তাদের ছিল না। বাড়ির জমিতে যে সব বড় বড় গাছ ও ফলফলাদি হত তারও মালিক ছিল জমিদার। গাছের ফল খাবার অধিকার তো ছিলইনা, বরং ফলের মৌসুমে নান্‌কারকেই সে ফল বয়ে নিয়ে জমিদার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হত। সরকারী আদালতে বিচার চাইবার কোন ক্ষমতা নানকারদের ছিলনা, এমন চিন্তাও তারা কখনও করতে পারেনি। জমিদারের কাছারিই ছিল একমাত্র আদালত এবং জমিদার স্বয়ং ও তার নায়েব মুন্সীরাই ছিল এই আদালতের হাকিম। ওদের মর্জি মাফিক মুখের কথাই ছিল আইন। এই মুখ দিয়ে যে দন্ড উচ্চারিত হত তার বিরুদ্ধে কোন আপীল বা আপত্তি চলতনা। কেবলমাত্র জমিদারের মর্জি কখনও পাল্টে গেলে রায়ের পরিবর্তন হতে পারত।

নান্‌কার মেয়েদের অবস্থা ছিল সবচাইতে মর্মান্তিক। তারা ছিল জমিদার বাড়ির চব্বিশ ঘন্টার বিনে পয়সার বাঁদী এবং জমিদার ও তার জোয়ান পুত্রদের ভোগের বস্তু। জমিদার পরিবারে খাবার মিলতনা, এমনকি পান সুপারীও নয়। জমিদারের হুকুম পালনের ফাঁকে ফাঁকে নান্‌কার পুরুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জমি চাষাবাদ করে ঘরে ফসল তুলে আনত আর মেয়েরা তা দিয়ে পরিবারের সবার ক্ষুধা নিবৃত্তির আয়োজন করত। কিন্তু তাও তারা শান্তিতে করতে পারতনা। জমিদার বাড়ির ডাক আসলেই নিজের সংসারের কাজ ফেলে রেখেই ছুটতে হত। স্বামী সন্তানদের দিকে তাকাবার ফুরসৎ তাদের হত না। শিশু সন্তানদের কঠিন অসুখ হলেও নান্‌কার মায়েরা কাজে গর-হাজির হওয়ার কথা ভাবতে পারতনা। কারণ তারা জানত এসব কোন ন্যায্য কৈফিয়ৎই জমিদারের পাষাণ মনকে গলাতে পারবেনা, বরং উল্টো সইতে হবে কঠিন শাস্তির যন্ত্রণা, নৃশংস মারপিট ও চরম লাঞ্ছনা। জমিদারের হুকুমে ২৪ ঘন্টা নিঃশেষে রক্ত ক্ষয় করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাওয়াটাই তাদের ভাগ্যের একমাত্র বিড়ম্বনা ছিলনা। তাদের জন্য সবচাইতে ভয়াবহ বিড়ম্বনা ও শাস্তি নেমে আসত গভীর রাতে- যখন জমিদারের হাতে নান্‌কার মেয়েদের নারীত্ব নিষ্ঠুরভাবে দলিত মথিত হত এবং তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসত বিভীষিকার কালো অন্ধকার। জমিদার বাড়ির কৈশোরোত্তীর্ণ পুরুষেরা নান্‌কারদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা চালাত এবং মেয়েদের বিনামূল্যে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করত। তাছাড়া নান্‌কারদের সুন্দরী বৌ-মেয়েকে কখনও লোভ দেখিয়ে কখনো কিনে নিয়ে, কখনো বা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিয়ে জমিদার বাড়িতেই বাঁদী হিসেবে আটকে রাখত। এদেরকে পারিবারিক কাজে ব্যবহার করে যেমন সমস্ত রস নিংড়ে নিত তেমনি এই পশুরা তাদের ভোগবিলাসের কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য অসহায় বাঁদীদের নারীত্বকে লুট করে নিত। চরিত্রহীন জমিদারদের ভোগ-লালসার আগুনে জন্ম নিত কতশত অবাঞ্ছিত শিশু তার ইয়ত্তা নেই। আবার এই সব শিশু জমিদারের রক্ত বহন করলেও তারা বেড়ে উঠত নান্‌কার পরিবারের নান্‌কারের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই।

কালইবিবির জীবন ছিল আর দশটা নান্‌কার মেয়ের মতই অভিশপ্ত, নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত। সেই কবেকার কথা। শৈশবকাল পেরোতে না পেরোতেই খালি গায়ে অথবা ছেঁড়াজামা গায়ে দিয়ে অন্যসব নান্‌কার পরিবারের ছেলেমেয়েদের মত কালই বিবিকেও জমিদারের হুকুম তামিলের জন্য ছুটে যেতে হয়েছে। সামর্থের চাইতে বেশী শ্রম দিতে হয়েছে। জমিদারদের অত্যাচার ও জুলুম থেকে বাচ্চাদেরও রেহাই ছিলনা। এদিকে ঘরে অন্ন জুটতনা ঠিক মত। অভাব-অনটন, দারিদ্র্য ছিল কালইবিবিদের নিত্য সঙ্গী। সামান্য জমিতে কতই বা ফসল ফলত। তার উপর ঠিকমত চাষাবাদ করার সময় ও সুযোগও মিলতনা নান্‌কারদের। দেখতে দেখতে কালইবিবি বড় হয়েছে। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে নিজের পরিবারের ও অন্য সব নান্‌কার পরিবারের নারী-পুরুষ ও বাচ্চাদের উপর

জমিদারের অকথ্য অত্যাচারের দৃশ্য, নিজেও সে এসব অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুমের শিকার হয়েছে। মাঝে মাঝে মনের গভীরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলেও তা তুষের ছাইচাপা আগুনের মতই চাপা পড়ে যেত। দীর্ঘকাল কালইবিবি ও তার গ্রামের নান্‌কাররা নীরবে মুখ বুঁজে সব অত্যাচারই সহ্য করে গেছে। তবে অতীত কাল থেকেই সারা জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে নান্‌কারদের বিদ্রোহী সত্তার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এসেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু একক বিদ্রোহ, গোষ্ঠীগত বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বহু নান্‌কার জমিদারকে খুনও করেছে। কেউ ঘটনা ঘটিয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছে, কেউ বা নিজের প্রতিশোধের আগুনে নিজেই পুড়ে মরেছে, কেউ বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে।

সিলেট জেলায় ১৯২২ থেকে এলাকা-ভিত্তিক একাধিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত নান্‌কার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সুখাইড় বিদ্রোহ (১৯২২-২৩), কুলাউড়া বিদ্রোহ (১৯৩১-৩২) প্রভৃতি বিদ্রোহ ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬-এ কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের যৌথ উদ্যোগে জন্ম নেয় নিখিল ভারত কিষাণ সভা এবং সে বছরই সিলেটে এর শাখা গঠিত হয় সুরমা উপত্যকা (সিলেট কাছাড় নিয়ে) কৃষক-সভা নামে। এই সংগঠনের নেতৃত্বেই পরবর্তীকালে এ জেলায় সংগঠিতভাবে নান্‌কার আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে নান্‌কাররাও সংগঠিত বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যায়। ১৯৩৮-৩৯এর রনিকেলী গ্রামের নান্‌কারদের বিদ্রোহ ছিল কৃষক সভার নেতৃত্বে প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে নান্‌কার মেয়েদের একটি অভিনব সংগ্রামী মিছিল সিলেট শহরে ও সারা জেলায় প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দু'শ নানকার মহিলা প্রত্যেকে একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে হাতে সেই লণ্ঠন বহন করে ১০/১২ মাইল পথ হেঁটে জেলাশাসকের বাংলোর সামনে হাজির হয়েছিল। একে মহিলাদের মিছিল, তায় আবার হাতে প্রজ্বলিত লণ্ঠন। এই অভিনব দৃশ্য দেখতে সারা শহরের মানুষ জেলাশাসকের বাংলোর সামনে ভেঙে পড়েছিল। বিশাল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে নান্‌কার মেয়েরা পুলিশ ও জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে এবং তাদের দেহের ক্ষত চিহ্নগুলো দেখায়। তারা জেলাশাসককে দায়িত্বহীন 'অন্ধশাসক' বলে অভিহিত করে এবং জানায় যে তারা নাকি অন্ধ শাসকের সামনে সত্যকে তুলে ধরার জন্যই দিনের বেলাতে লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে এসেছে। এই মিছিলের তেজ ও শক্তিকে জেলাশাসকও উপেক্ষা করতে পারেনি। মিছিলকারীদের সামনে এসে তাকে দ্রুত প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। এই মিছিলের খবর শহর থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা জেলায়, সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরন তুলে ধরলাম এ কারণেই যে এই মিছিলের খবর পৌঁছেছিল লাউতা বাহাদুর এলাকার কালইবিবি সহ সমস্ত নান্‌কার মেয়ে-পুরুষের কানেও যে খবর তাদের মনে জ্বেলেছিল নতুন আশার আলো এবং প্রেরণা যুগিয়েছিল নান্‌কার প্রথা উচ্ছেদের সর্বশেষ ঐতিহাসিক বিদ্রোহে। শেষ সীমান্তের এই বিদ্রোহের কাল-পর্বটি হল ১৯৪৫

থেকে ১৯৫০ সাল। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহেই কালইবিবিকে দেখেছি আমরা সংগ্রামী নেত্রীর ভূমিকায়।

লাউতা-বাহাদুরপুর এলাকার মেয়ে কালইবিবি কি ভাবে কখন এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত হ'ল তারও একটি কাহিনী আছে। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কালইবিবির গ্রামের নান্‌কাররা জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কৃষক সমিতিতে সংগঠিত হয়। কালইবিবিরা আশায় বুক বাঁধে। কালইবিবির ভাষায়, " মনর ভিতরে বল পাইলাম। আর ডরাইবার কিছু নাই। আমরার লগে আছইন লালঝান্ডার নেতারা- কৃষক সমিতির নেতারা। ইবার জমিদার গুষ্টি উচিত শিক্ষা পাইব।" তারপর ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হল বিশাল এলাকা জুড়ে মূল নান্‌কার আন্দোলন। ঘটনা ও আন্দোলনের মুল কেন্দ্রবিন্দু ছিল লাউতা-বাহাদুরপুর। ঘটনাটি এরকম : প্রতিদিন জমিদারের ঘোড়া কৃষকের ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলত। উত্তেজিত কৃষকরা বল্লম দিয়ে ঘোড়াকে মেরে ফেলে। ক্ষিপ্ত হয়ে জমিদার অন্যায়ভাবে ঘোড়ার মৃত্যুর জন্য নারায়ণপুর গ্রামের নান্‌কারদের অভিযুক্ত করে এবং কাছারিতে ডেকে এনে তাদের দু'জনকে চাবুক দিয়ে নৃশংসভাবে মারতে থাকে এর মধ্যে একজন ছিল কৃষক সমিতির কর্মী। সেই কর্মিটি জমিদারের হাতের চাবুক কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং অন্য আহত সঙ্গীটি সহ সবাইকে নিয়ে চলে আসে কৃষক সমিতির অফিসে। সেখানেই হাজার হাজার নান্‌কার কৃষকের উপস্থিতিতে জমিদারের বয়কট, হদবেগারী বন্ধের ও নান্‌কার প্রথা বিলোপের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন থেকে নান্‌কাররা আর যায়নি জমিদার বাড়িতে তার হুকুম পালনের জন্য। নান্‌কার প্রথা বিলোপ ও জমি-বাড়ির উপর নান্‌কারদের জোত-স্বত্ব কায়েমের দাবীতে শুরু হল বেগবান নান্‌কার আন্দোলন। প্রতিদিন মিছিল, বৈঠক-সভা চলতেই থাকল। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য দেশভাগের আগে আসাম প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার যেমন তীব্র পুলিশী জুলুম চালিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের পক্ষভুক্ত হয়ে তেমনি পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারও একই ভাবে জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করে নান্‌কারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল তার হিংস্র পুলিশ বাহিনীকে। একদিকে কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগের জমিদাররা ঐক্যবদ্ধ, তাদের সাথে রয়েছে প্রবল পরাক্রান্ত সরকার, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান নান্‌কার ও কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধ জুলুম প্রতিরোধে ও লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশ-বিভাগ কালেও সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়েও এই ঐক্য বিনষ্ট করা সম্ভব হয়নি। কালইবিবি এই আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচন্ড সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ও দক্ষতার সাথে নান্‌কার মেয়েদের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

কালইবিবিকে আমি প্রথম দেখি সিলেট শহরে নান্‌কারদের এক বিশাল মিছিলের পুরোভাগে- গায়ের রং কালো,চেহারাখানা ভারি মিষ্টি, তবে সে চেহারায় ফুটে উঠেছে

শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ,ঘৃণা ও সংগ্রামী প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি, উচ্চতায় বেশ লম্বা, শরীরের বাঁধন খুবই মজবুত,দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত পরিশ্রমী শরীর। বয়স ২২/২৩-এর বেশী হবেনা। সম্ভবত আমার সমবয়সীই হবে। কালো রঙের একটি খাটো আধ ময়লা মোটা শাড়ী দু'প্যাচ করে পরা, মাথায় ঘোমটা, গায়ে কোন ব্লাউজ নেই, শাড়ির আঁচল দিয়েই গাখানা জড়িয়ে রেখেছে। অভাবী মেয়েরা যে পোশাকে কাজ করে ঘুরে বেড়ায় এ সেই পোশাক। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে কালইবিবি। ধূলি-ধূসরিত খালি পা দুটো চোখে পড়ছে, ২২ মাইল পথ হেঁটেও যে পদযুগল ক্লান্তি স্বীকার করতে চাইছেনা। কালইবিবির পেছনে রয়েছে শত শত নান্‌কার মহিলা, তার পাশে রয়েছে আরও আরও জঙ্গী মহিলা নেত্রী। কালইবিবি মেয়েদের শ্লোগানে নেতৃত্ব দিচ্ছে গলা চড়িয়ে, অন্যেরা সেই শ্লোগানের ভাষা পূরণ করছে শত শত কণ্ঠের সম্মিলিত আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। কি জোর সেই শ্লোগানে, শ্লোগান তো নয় যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত বজ্রপাতের হুঙ্কার। নান্‌কার মেয়েদের পেছনে আসছে হাজার হাজার পুরুষ নান্‌কারের মিছিল। শহর থেকে লাউতা বাহাদুরপুর প্রায় ২২ মাইল দূরে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে এই মিছিল দু'পাশের জনবসতিকে আলোড়িত করে, অবশেষে শহরে পৌঁছে শহরবাসীকে অভিভূত ও আলোড়িত করে।

মিছিলের পর সিলেটের ঐতিহাসিক গোবিন্দপার্কে (যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সুপার মার্কেটের তলায় চাপা পড়ে) জনসভা শুরু হয়। বিশাল জমায়েত, নান্‌কার মেয়ে-পুরুষ, কৃষক ছাড়াও শহরের সর্বস্তরের মানুষ, ছাত্রসমাজ ভেঙ্গে পড়ে সেই সভায়। কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ছাড়া ঐ সভায় আরও যাঁরা বক্তব্য রাখলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আন্দোলনের স্থানীয় নেতা নঈমউল্লা ভাই ও নান্‌কার নেত্রী কালইবিবি। উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কালইবিবি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিল তখন আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গ্রাম্য, নিরক্ষর, নির্যাতিত একটি গরীব নান্‌কার বধূ জীবনে প্রথম শহরের এতবড় জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, কিন্তু এতটুকু আড়ষ্টতা ও জড়তা তার মধ্যে নেই। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে বার বার ডান হাতের মুষ্ঠি সামনের দিকে উঁচিয়ে সিলেটের খাঁটি গ্রাম্যভাষায় সে বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছে। কি চমৎকার সেই ঝরঝরে ভাষা ও উচ্চারণের স্পষ্টতা, কণ্ঠস্বর কত মধুর অথচ কি বলিষ্ঠ। কালইবিবি তার বক্তৃতায় তুলে ধরেছে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা ও বেদনাকে, বর্ণনা দিচ্ছে নির্যাতনের বহু ঘটনার, ব্যক্ত করছে সবচাইতে অত্যাচারিত নান্‌কার মেয়েদের গভীর দুঃখ-বেদনার কথা, প্রকাশ করছে শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ এবং উচ্চারণ করছে সংগ্রামের বলিষ্ঠ শপথ। এক এক সময় তার মুখের অভিব্যক্তি এক এক রকম। কখনও সেই মুখে গভীর বেদনার ছায়া, কখনও ঘৃণা ও ক্রোধের কাঠিন্য, কখনও বিশ্বাস ও সংকল্পের দৃঢ়তা। একজন বক্তা ও তার বক্তৃতা কিভাবে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে এবং তাদের মনে সহানুভূতি জাগাতে পারে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে কালইবিবি। ওকে প্রথম দেখার এই দিনটির স্মৃতি

আজও আমাকে জীবনে ও সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৭–এ কালইবিবির সাথে এই প্রথম দেখার দিনটি থেকে '৪৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তার সাথে আমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়েছে যে সে হয়ে উঠেছে আমার অতি আপনজন ও সংগ্রামের বলিষ্ঠ সাথী। প্রথমেই কালইবিবি ও আরও কয়েকজন নান্‌কার মেয়েকে নিয়ে শহরের বিশিষ্ট মহিলা নেত্রীদের কাছে গিয়েছি নান্‌কার আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন আদায়ের জন্য। আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা ছিল কালইবিবিরই। কালইবিবির বক্তব্যে নির্যাতিত মানুষের, বিশেষভাবে নারী জাতির দুঃখ–বেদনার প্রতি সংবেদনশীল ঐ সব মহিলারা আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত না করে পারেননি। এর পর আমি নিজে কয়েকবার কালইবিবিদের এলাকায় গিয়েছি, থেকেছি, তাঁদের সাথে কাজ করেছি এবং এভাবেই কালইবিবিকে গভীরভাবে চেনার ও জানার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য ওদের নিজ গ্রামে যাওয়া কখনই সম্ভব হয়নি পুলিশ ক্যাম্পের সতর্ক প্রহরার জন্য। থেকেছি পার্শ্ববর্তী এলাকার উলুড়ি গ্রামে আত্মগোপন অবস্থায়। সেখানে থেকেই তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছি এবং তাদের লড়াইয়ের সব খবরাখবর পেয়েছি।

কালইবিবির নেতৃত্বে নান্‌কার মেয়েরা সভা, মিছিল ও সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি সরকারী দমননীতি ও পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সাথে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। কালইবিবি ও তার সহযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের একটি কাহিনী এখানে তুলে ধরছি, যা থেকে তাদের সংগ্রামী ভূমিকার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

একদিন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীসহ দারোগা নন্দীরপাল গ্রামে গিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ি তল্লাশি করে এবং একটি বাড়ি থেকে অন্যতম নেতা নঈমউল্লা ভাইকে গ্রেফতার করে। এ সময়ে সারা গ্রামে আর কোনও পুরুষ ছিলনা। নঈমউল্লা ভাইয়ের গ্রেফতারের খবর শুনে নান্‌কার মেয়েরা সবাই মিলে পুলিশবাহিনীর পেছনে ধাওয়া করে। আকস্মিকভাবে এক নান্‌কার মহিলা দারোগার শার্টের কলার ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তার উপর চেপে বসে। পুলিশ এ ধরনের ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশ একেবারে হকচকিয়ে যায়। তখন ওরা নঈমউল্লাকে ছেড়ে দিয়ে দারোগাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যায়। শুরু হয় নান্‌কার মহিলাদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি। এ সময় কালইবিবি পুলিশের হাত থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে দারোগার মাথায় আঘাত করে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ বাহিনী কোন রকমে মহিলাদের হাত থেকে দারোগাকে উদ্ধার করে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। দারোগাকে আক্রমণ করার অভিযোগে পরে কালইবিবিকে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশ হেফাজতে তাকে অকথ্য অত্যাচার ও জুলুম সইতে হয়। উপস্থিত বুদ্ধি, প্রচন্ড সাহস ও দৃঢ় সংগ্রামী মনোবলের পরিচয় দিয়ে কালইবিবি অতি সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের কাতার

থেকে উঠে এসেছে অসাধারণ বীর রমণীদের পর্যায়ে এবং সবার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে। তাকে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন থেকে আজও কেউ টলাতে পারবেনা।

পুলিশের বিরুদ্ধে মেয়েদের রুখে দাঁড়ানোর বহু ঘটনাই ঘটেছে। আন্দোলন যত তীব্র হয়েছে পুলিশের হামলাও ততই বেড়েছে। পুরুষ নেতাকর্মীদের পেলেই গ্রেফতার। ফলে পুরুষরা প্রায় সময় নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যান্য গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিত এবং মেয়েরা ঘর আগ্‌লাত। তাই পুলিশ যখন বাড়ি বাড়ি হামলা করত তখন মেয়েরাই এগিয়ে যেত প্রতিরোধের লড়াইয়ে। এ সব লড়াইয়ে কালইবিবির মত আরও অনেক সাহসী রমণীর দেখা পাই। এদের সাহস ও মনোবলকে কালইবিবি তার চেতনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে আরও শানিত ও তীব্র করে তুলেছিল। এমনি একটি মেয়ে তহমিনা। একদিনের ঘটনা– পুলিশ বাহিনী নন্দী পাল গ্রামে ঢুকে নান্‌কারদের বাড়িঘর তছ্‌নছ্‌ করতে থাকে। তহমিনা একা ঝাঁটা হাতে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেই পুলিশ তার ঘরে জোর করে ঢোকার জন্য এগিয়ে গেছে তক্ষুনি তহমিনা পথ আটকে দাঁড়ায় এবং তার হাতের ঝাঁটা দিয়ে পুলিশকে আঘাত করে। এর পর আহত পুলিশকে নিয়ে গোটা বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে অবশ্য পুলিশকে আক্রমণ করার অভিযোগে তহমিনাকে গ্রেফতার করা হয়, তার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানো হয় এবং তার বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়। কোর্টে দাঁড়িয়ে তহমিনা এমনভাবে গ্রামবাসী ও তার নিজের উপর পুলিশী অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছিল এবং তার কাজের ন্যায্যতাকে তুলে ধরেছিল যে সরকার তার বিরুদ্ধে এই মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

পুলিশের হামলা ও অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য কালইবিবিরা সব সময় দা, বটি, ঝাঁটা, লাঠি ইত্যাদি ঘরে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকত। কালই ববির নিজের মুখে শোনা কাহিনীর একটি এখানে উল্লেখ করছি। একদিন পুলিশ তার চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে তাকে ঘর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করে। কালইবিবি তড়িৎ গতিতে দা হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে তুলে ধরেছে। ক্রুদ্ধ কালইবিবি হুঙ্কার ছেড়ে বল্‌ল, "এক্ষুনি আমার চুল ছেড়ে এখান থেকে চলে যা, নইলে দা দিয়ে তোকে একেবারে শেষ করে ফেলব।" পুলিশকে পালিয়ে যেতে হল। আসলেই কালইবিবিরা সারাজীবন নান্‌কার বাঁদী হয়ে যে সীমাহীন অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, চিরতরে সেই অত্যাচারের অবসান ও নান্‌কারপ্রথা বিলুপ্তির এই লড়াইয়ে তারা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া, নিঃশঙ্কচিত্ত। তবে ব্যক্তিগত ইচ্ছা–অনিচ্ছা বা আবেগের বলে তারা কোন পদক্ষেপ নিতে যায়নি। তাদের আনুগত্য ছিল কৃষক সমিতির প্রতি, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি, কৃষক সমিতির সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছু করার কথা তারা ভাবতে পারেনি। কালইবিবি সমস্ত নান্‌কার মেয়েদের সংগঠিত করেছিল কৃষক সমিতিতে এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে।

কালইবিবিদের সাথে একত্রে দিনযাপনের একটি স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনা। এই স্মৃতি আমার অভিজ্ঞতার ভান্ডারে একটি অমূল্য সঞ্চয়। নান্‌কার মেয়েদের একটি

সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল লাইতা বাহাদুরপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে। কালইবিবির নেতৃত্বে নান্‌কার মহিলা কর্মীরাই এই সম্মেলনের যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করেছিল। অবশ্য কৃষক সমিতির নেতারা তাদের কাজে প্রয়োজনমত সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। আমি তখন উলুড়ি গ্রামে আছি। যতদূর মনে পড়ে অসিতাও ছিল আমার সাথে। সম্মেলনের দিনে সিলেট থেকে হাজেরা মাহমুদও এসেছিলেন গোপনে। ঐ সম্মেলনে কোন আড়ম্বর ছিলনা একেবারেই, সাদাসিধে ব্যবস্থা– ঠিক যেমনটি গ্রামে কৃষকদের সভাসমিতি করার রেওয়াজ ছিল। লম্বা ধাঁচের একটি বড় বেড়ার ঘরে সম্মেলনের জায়গা করা হয়েছিল। মাটির উপর চাটাই বিছিয়ে সবার জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পৃথক কোন মঞ্চ বা আসনের ব্যবস্থা ছিলনা। অতিথি হাজেরা মাহমুদ সহ আমরা সবাই নান্‌কার মেয়েদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বসেছিলাম। এবং যার যার জায়গা থেকেই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সম্মেলন চলেছিল। কালইবিবিই ছিল মূল বক্তা। সে তার বক্তব্যে নানকার মেয়েদের দুঃখময় জীবনের কথা এবং আন্দোলনে মেয়েদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছিল। আরও অনেক মেয়েই বক্তব্য রেখেছিল এবং তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে এ লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিল। সেদিন বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম– বন্ধন থেকে মুক্তির লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই মানুষকে কি ভাবে পাল্টে দিতে পারে– যদি গড়ে ওঠে প্রয়োজনীয় সংঘশক্তি। ঘরের কোণে বন্দী হয়ে অথবা জমিদারের অন্দর মহলে যারা মুখ বুঁজে সব অত্যাচার সহ্য করে বাঁদীর জীবন কাটিয়েছে, সেই মেয়েরা কিভাবে মাত্র ২/৩ বছরের মধ্যে এত ভাল বক্তা ও সংগঠক হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেতোনা।

সম্মেলনের মাঝখানে বিরতি দেওয়া হল দুপুরের খাবারের জন্য। এই খাবারের পর্বটি সত্যিই আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নানকার মেয়েরা সবাই ছিল মুসলিম, আন্দোলনের গোটা এলাকায় মুসলিম নান্‌কাররাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। কালইবিবিরা জানত আমরা কমিউনিস্টরা জাত–পাত মানিনা, সবার বাড়িতে সবার সাথে বসে আমরা খেতে পারি। সেদিক থেকে কোন সমস্যা ছিলনা। তবে এই অভিজ্ঞতাটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। শহরের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল গ্রামের গরীব হিন্দু কৃষকের বাড়িতে খাওয়ার, কিন্তু গরীব মুসলিম নান্‌কার মেয়েদের সাথে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বড় ভাল লাগছিল এই খাওয়ার পরিবেশটিকে। যে বাড়িতে সম্মেলন সে বাড়িতেই রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে ঘরটায় সম্মেলন চলছিল সেই ঘরটাতেই আমরা সবাই গোল হয়ে খাবার জন্য বসে গেলাম। সবার সামনে দেওয়া হল একটা করে মাটির সান্‌কি। কালইবিবিদের একসাথে তাদেরই মত সান্‌কিতে ভাত খাওয়ার অনন্য আস্বাদ উপভোগ করেছিলাম সেদিন। জীবনে এটা ছিল এ ধরনের প্রথম অভিজ্ঞতা। কালইবিবিদের সাথে যেন আরো বেশী একাত্ম হয়ে গেলাম। খেতে খেতে কত গল্প, কত রসিকতা, কত যে খুচরো আলাপ হল তার সীমা নেই। কালইবিবির গল্প ও রসিকতাও ছিল বড় উপভোগ্য । সিলেটের ঐ

অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার মাধুর্যের সাথে যারা পরিচিত নন তাদের কাছে তা হয়তো দুর্বোধ্যও মনে হত। নানকারদের শত্রু জমিদার, সরকার ও তার পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে কালইবিবি যে সব গালি–গালাজের ভাষা ব্যবহার করত আমার কাছে মনে হ'ত অন্য কোন শব্দের প্রয়োগে ঐ গালি গালাজের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিলনা।

এর পর কালইবিবির সাথে আমার বোধ হয় মাত্র ২/১ বার দেখা হয় যখন ১৯৪৯–এ আন্দোলনের শেষপর্যায়ে আমি ঐ এলাকার উলুরি গ্রামে গিয়ে মাস দুয়েক ছিলাম। নান্‌কার আন্দোলনের সমর্থনে কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করাই ছিল প্রধান কাজ। আন্দোলন যখন গ্রাম ও শহরের সর্বমহলের, সব সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ, কৃষক, অকৃষকের সমর্থনে প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তখন পাকিস্তান সরকার একদিকে আন্দোলনের নেতা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতিকে 'পাকিস্তান বিরোধী ভারতের দালাল' ইত্যাদি অপপ্রচার চালিয়ে আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, অন্যদিকে দমননীতি ও পুলিশী জুলুমকে তীব্রতর করে তোলে। অত্যাচার শুরু হয় পার্শ্ববর্তী কৃষক প্রজাদের উপরও। এই দমননীতি বেড়ে যাওয়ার ফলে কালইবিবির সাথে আমার আর দেখা করার সুযোগ হয়নি। আমি সে এলাকা ছেড়ে চলে আসার মাস দুই পরেই উলুরির পাশের গ্রাম সানেশ্বরে এক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে। এক বিশাল জন–জমায়েতে পুলিশের অতর্কিত গুলিবর্ষণে চারজন শহীদ হয়, আহত হয় বেশ কয়েকজন। এ সময় শহর থেকে অর্পণা, অসিতা, সুষমা সেখানে গিয়েছিল। ওরাও এই ঘটনায় আহত হয় এবং পরে অনেকের সাথে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

যাই হোক শহীদদের রক্তদানে এবং নান্‌কার কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ লড়াই–সংগ্রামের ফলে অবশেষে আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়। ১৯৫০–এ সরকার নান্‌কার প্রথার অবসান ও নান্‌কারদের জমি–বাড়ির উপর জোত–স্বত্ব কায়েমের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। শত শত বৎসরের গোলামী–প্রথার অবসানে কালইবিবি যে অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তার জন্য আজ আবার তাকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! এক গোলামীর বাঁধন টুটল, কিন্তু অত্যাচার শোষণ জুলুমের স্টীম রোলার চলতেই থাকল। আন্দোলনের মূল নেতারা অনেকে গ্রেফতার হলেন, অনেকে ঐ এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হলেন। স্থানীয় নেতা–কর্মীরা যাঁরা গ্রেফতার হননি তাঁরা অনেকেই পালিয়ে আসামে চলে গিয়েছিলেন। অনুমান করা হয় কালইবিবিও হয়ত আসামের কোথাও চলে গিয়ে সেখানেই ঠাঁই করে নিয়েছে। আমরাও ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে সিলেট ছেড়ে কতদূরে চলে এসেছি। জানিনা লাউতা, বাহাদুর এলাকায় কৃষকদের স্বার্থে– মেহনতী মানুষের স্বার্থে সংগঠন আন্দোলন হচ্ছে কি না, এ কাজে তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে আসছে কি না, কালইবিবির মত নেত্রী জন্ম নিচ্ছে কি না।

লাউতাবাহাদুরপুরে ও সারাদেশের গ্রামাঞ্চলে কালইবিবির মত অকুতোভয় দৃঢ়চেতা অসংখ্য সংগ্রামী নেত্রী জন্ম লাভ করুক– এটাই আমার কামনা ও প্রত্যাশা।*

\[এই লেখাটি লিখতে গিয়ে কিছুটা সাহায্য নিয়েছি শ্রদ্ধেয় অজয় ভট্টাচার্য রচিত 'নান্‌কার বিদ্রোহ', প্রথম খন্ড ও দাদা বারীন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথা 'সংগ্রাম মুখর দিনগুলি ' নামক বই থেকে\]

আমার স্বামী রোহিণীদাস

রোহিণী দাসকে আমি প্রথম কবে দেখেছিলাম তা আজ আর মনে পড়েনা। তবে এটুকু মনে পড়ে ১৯৪৮–এ আমাদের বিয়ের পাঁচ বছর আগে থেকেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং তাকে জীবনসাথী হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার বয়স তখন উনিশ। গ্রামে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার কাজই ছিল রোহিণী দাসের মুখ্য কাজ, তবে শহরে নানা কাজে প্রায়ই তাঁকে আসতে হত এবং থাকতে হত। থাকার মূল আস্তানা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে, তাছাড়া কখনও আমাদের বাড়িতে অথবা অন্য কোন কমরেডের বাড়িতেও তিনি আস্তানা গাড়তেন। পার্টি অফিসে কর্মীদের সাধারণ সভায় তাঁকে দেখেছি অন্যান্য সেরা নেতাদের পাশে কোণ ঘেঁযে বসে আছেন। প্রয়োজন হলে বক্তব্য রাখতেন, না হলে নয়। এসব বৈঠকে কম কথা বললেও লক্ষ্য করতাম চশমার কাঁচ ভেদ করে তাঁর উজ্জ্বল দু'টি চোখ যেন গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে উপস্থিত সবার চিন্তার অভিব্যক্তি এবং পরীক্ষা করছে তাঁদের একাগ্রতা ও মনোযোগিতা। রোহিণী দাসকে কখনও শহরের কোন জনসভায় বক্তৃতা দিতে দেখিনি, কিন্তু গ্রামে কৃষকদের ঘরোয়া বৈঠক ও কৃষক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য শুনেছি, গ্রামের মানুষের কাছে বোধগম্য প্রাঞ্জল আঞ্চলিক ভাষায় চমৎকারভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। তাঁকে আরও নানাভাবে নানা জায়গায় দেখেছি। গ্রামের কৃষক–পরিবারের অন্দরমহলে তাদেরই আপনজন হয়ে থাকতে, তাঁকে দেখেছি পার্টি পত্রিকা অফিসে পত্রিকা পরিচালনার কাজে দারুণ ব্যস্ত, একনিস্ঠ ও দক্ষ এক নেতার ভূমিকায়। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখতাম খাবার ঘরে দাদাদের পাশে বসে নীরবে খাচ্ছেন, রাতে বাইরের ঘরে অনেক লোকের ভিড়ে একটু শোওয়ার জায়গা করে নিচ্ছেন। আমার বাবার কাছে তাঁকে আসতে দেখেছি ফাইলপত্র নিয়ে, কখনও বাবা নিজেই ডেকে পাঠাতেন। বন্যা, খাদ্য সংকট, রিলিফ ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব সর্বদলীয় কমিটি হত সে সব কমিটির সভাপতি হতেন বাবা আর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রোহিণী দাস বাবাকে এসব কাজে সাহায্য করতেন। তাঁর কাজে বাবা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বাবার ধারণা ছিল তাঁরমত একনিষ্ঠ দায়িত্বশীল নীরবকর্মী, আত্মপ্রচারে বিমুখ রাজনৈতিক নেতা জেলাপর্যায়ে খুব কমই আছে। যদিও বাবা মতবাদের দিক থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ছিলেন– তবু তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল।

রোহিণী দাসের বেলায় এটা একটু বেশীই ছিল। আমাদের বাড়ির কারো অসুখ-বিসুখ হলে তাকে দেখতাম দক্ষ সেবকের ভূমিকায়। রোগীর সেবাতে তাঁর অসাধারণ ধৈর্য ও মনোবল দেখে ঐ বয়সেই আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দূর থেকে লক্ষ্য করেছি তাঁর সাদাসিধে জীবন যাপনের ধরন-ধারণ এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা শহরে- যখন তিনি থাকতেন তখন তাঁকে প্রায়ই দেখতাম জ্যোতির্ময়দার (জ্যোতির্ময় নন্দী, সম্পর্কে আমাদের নাতি) সাথে জোড়া বেঁধে চলছেন। অনেক সময় বন্দর-বাজার পাইস হোটেলে দু'জনে একসাথে সস্তায় খাবার খেতে যেতেন। আর দু'জনেরই আর একটা নেশা ছিল, যখন-তখন কাজ না থাকলেই একত্রে তাঁরা সিনেমা দেখতে যেতেন। আর একটা বাজে নেশা ছিল রোহিণী দাসের, সারাক্ষণ সিগারেট ফুঁকতেন, 'চেইন স্মোকার' বললে অত্যুক্তি হয়না। এর কুফলটা ভোগ করেছেন শেষ জীবনে যন্ত্রণাদায়ক ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে। রোহিণী দাসকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার সুযোগ পাই যখন আমি ও আমার বান্ধবী অঞ্জলি একই পার্টির জেলা কমিটির সদস্য হই। জেলা কমিটির সভাগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর ভূমিকা থেকে বুঝতে আরম্ভ করলাম তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তত্ত্বীয় জ্ঞান কত গভীর, বাস্তব পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ ও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর কি অসাধারণ দক্ষতা। এভাবেই আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁর সাথে আমার কথা বলার সুযোগ ছিল খুবই কম। কিন্তু যখনই কথা বলেছি তখনই তাঁর চমৎকার সংবেদনশীল মন ও স্নেহের স্পর্শ আমি অনুভব করেছি। তাঁর সাথে আমার বয়সের তফাৎ ছিল প্রায় ১৪ বছর। আমার দু'নম্বর দাদা বারীন্দ্র দত্তের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এর পরে আমার আরও যে তিন দাদা রয়েছেন তাঁদেরকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন।আমার দিদিকে শ্রদ্ধা করতেন নিজের দিদির মতই। সাধারণত যেভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, প্রেম নিবেদন হয়, আমাদের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই হয়নি। ইউনিভার্সিটির করিডোর বা ক্যাম্পাসে, পার্কের নিরিবিলি পরিবেশে নিভৃত প্রেমালাপের কোন ঘটনাই ঘটেনি আমাদের জীবনে। ঐ লোকটির পারিবারিক পরিচয় ও অবস্থান বংশমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুই আমি জানতামনা, জানার আগ্রহও ছিলনা, এসব ব্যাপারে কোন প্রশ্নও মনে জাগেনি। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে তিনজনকে আমি চিনতাম, যাঁরা ছিলেন পার্টির সেরা অলঙ্কারদের অন্যতম। একজন কৃষকনেতা করুণাসিন্ধু রায়, যাকে তাঁরা বড়দা বলে ডাকতেন, দ্বিতীয় জন বড়দার ছেলে বরুণ রায়, ছাত্রসংগঠনে আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, তৃতীয় জন উপমহাদেশের বিখ্যাত লোকশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, রোহিণী দাসের সম্পর্কিত ভাইপো এবং গণনাট্য সংঘের সে ছিল আমার প্রিয় সাথী। সিলেট জেলায় রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করতে গিয়ে একই রাজনৈতিক আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ একটি উঁচুমানের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বহু ত্যাগী নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধাভাজন নেতা ও সহকর্মীর সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি, কিন্তু তাঁদের সবার মাঝ থেকে রেহিণী দাসকে কেন আমি

জীবনসাথী হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এর উত্তর জানে একমাত্র আমার মন। আমি আমার মনের কাছে এই উত্তর পেতে চাইনা। কারণ তাঁকে আমার স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি হয়েছি ধন্য ও পরিতৃপ্ত। অতএব এই উত্তর হবে অবান্তর। যাই হোক মুস্কিলে পড়লাম কিভাবে যে আমার ইচ্ছা ও প্রস্তাব রোহিণী দাসকে জানাই তা নিয়ে। সরাসরি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

ঐ সময়ে যাদের কাছে মন খুলে সব কিছু বলতে পারতাম তাদের মধ্যে ছিল আমার বান্ধবী অঞ্জলি। ওকেই সব জানালাম, তারপর ওরই পরামর্শে কয়েকটি খুঁটি ধরে আমার দেবীদা (বারীনদত্ত) পর্যন্ত কথাটা পৌঁছালাম। বয়সের দূরত্বের কারণে তাঁর সাথেও আমার কথাবার্তা ছিল বড় আড়ষ্ট, ভয় ও সঙ্কোচে জড়ানো। রোহিণী দাসের সাথে দেবীদার আলাপের পর আমার ডাক পড়ল দেবীদার ঘরে। আমার পা দুটো যেন চলতে চায়না, কি শুনব এই ভয়ে আমি অস্থির। শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে দেবীদার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁকে খুব চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে হল। তবু আমাকে দেখেই তাঁর চিন্তার বোঝাকে সামলে নিয়ে স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি হেসে বলতে লাগল, " রোহিনী তো তোকে খুবই পছন্দ করে এবং অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু তাঁর কাছে এই প্রস্তাব আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। সে মনে করে বংশের দিক থেকে তাঁর যে সামাজিক অবস্থান তাতে বাবা কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হবেন না। কারণ বাবার রয়েছে বংশমর্যাদা ও অভিজাত্য সম্পর্কে এক ধরনের অহঙ্কার। আমারও তাই ধারণা। আর আমরা উভয়েই মনে করি বাবার মনে আঘাত দিয়ে তাঁর অসম্মতিতে কোন কিছু করা সমীচীন হবেনা। তবে বিষয়টা আমরা নাকচ্ করে দিচ্ছিনা। বাবাকে এখনই কিছু বলা হবেনা। অপেক্ষা করতে হবে, অবস্থা বুঝে তাঁর সম্মতি আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে এর নেতিবাচক পরিণতির জন্য যদি বাবার সম্মতি না পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটাই মাত্র ইতিবাচক দিক আছে সেটা হ'ল বাবা রোহিণীকে ব্যক্তি হিসেবে খুবই পছন্দ করেন। আর একটা সম্ভাবনার দিক হ'ল বাবা কখনই ছেলেমেয়ের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাননা। এর বড় প্রমাণ হ'ল কমিউনিস্ট রাজনীতি তিনি সমর্থন করেন না, তবু ছেলেমেয়েদের ঐ পথে যেতে তিনি বাধা দেননি। দেবীদা যে ভাবে সব কিছু বুঝিয়ে বলল্ তাতে আমার নতুন করে চৈতন্যোদয় হল। আসলেই সামাজিক বাধার বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন ধারণাই ছিলনা। মেনে নিলাম বাস্তবতাকে আর আশা করতে লাগলাম বাবার আশীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত না হই। বছর গড়িয়ে চলল। এর মধ্যে মায়ের মৃত্যু হল আকস্মিকভাবে ঐ বছরই। আমরা পাঁচভাইবোন কেউই সে সময় উপস্থিত ছিলামনা। মৃত্যুশয্যায় শেষ কয়েক ঘন্টা আমার দুই দাদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রোহিণী দাস, তাঁর অক্লান্ত সেবা দিয়ে যমদূতকে পরাস্ত করার জন্য সব কিছু করেছিলেন। শ্মশানে মাকে দাহ করা পর্যন্ত এবং এর পরেও তিনি ছিলেন বাবার প্রধান অবলম্বন।

চার বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে, ইতিমধ্যে আমি সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে অনবরত কাজ করে যাচ্ছি জনমানুষের মাঝে। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার কাছে কেউ কথাটা তুলতে সাহস করছেনা। এদিকে ১৯৪-৭এ দেশভাগ হল, পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিক হলাম আমরা। কমিউনিস্টদের ওপর শুরু হল সরকারের অকথ্য নির্যাতন। বাধ্য হয়ে '৪৮ থেকে আমাদের চলে যেতে হল আত্মগোপন অবস্থায়। বাবা তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি বোধ হয় আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত চিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে–বাবার সম্মতি নিয়ে আমাদের সবার এত দুশ্চিন্তা ছিল তিনি নিজেই দাদাদের ডেকে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন এবং রোহিণী দাসের সাথে বিয়েতে খুশী মনে মত দিলেন। তাঁরই ইচ্ছেতে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে বিয়ের বিষয়টি পাকা হল। সিলেটে তখন কোন কিছুই সম্ভব ছিলনা। আমাদের চলে যেতে হ'ল কোলকাতায়। আমি গিয়ে উঠলাম পিও, শশীভূষণ দে স্ট্রীটে আমার পিস্‌তুতো দাদা ধনদার বাড়িতে। আমার পিসীমাও তখন বেঁচে ছিলেন এবং বাড়িতেই ছিলেন। রোহিণীদাস ভিন্নভাবে গিয়ে তাঁর আত্মীয় বাড়িতে উঠলেন। বাবা আমার তিন নম্বর দাদা তরুদাকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। '৪৮–এর ২৮শে জুন ১৪ই আষাঢ় আমাদের বিয়ে হ'ল, সেদিন দুপুরের দিকে প্রবল বর্ষণের মধ্যে আমরা ট্যাক্সিতে ধর্মতলা স্ট্রীটে রেজিস্ট্রেশন অফিসে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার দুই দাদা, গিয়ে দেখি পাত্রপক্ষ হাজির সাক্ষী সাবুদ নিয়ে। রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়ে গেল ভালয় ভালয়। সন্ধ্যায় ধনদার বাড়িতে সব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবদের নিয়ে একটা পার্টির আয়োজন করা হল। অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে গোটা বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গেল। বিয়ের দু'তিন দিন পরই আমরা সিলেট ফিরে যাওয়ার জন্য প্রথমে ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। কোলকাতা থেকে ঢাকায় আমার দিদির বাড়ি পর্যন্ত আমরা দু'জন একত্রেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকাতে দু'দিন থাকার পর আমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। দুজন ভিন্নপথে ভিন্নভাবে সিলেট গেলাম। এর পর থেকে আচমকা দেখা হত দুজনের, কখনও শহরে কখনও গ্রামে। গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলাম বিয়ের মাস খানেক পর কিন্তু নিজ বাড়িতে নিজের মায়ের কাছে এক রাতের বেশী থাকা ছিল বিপদজনক। আমার শাশুড়ির সেকি কান্না! একমাত্র ছেলে, ছেলের বৌকে কাছে রাখতে পারছেন না। তবে বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে বেহেলীতে রোহিণী দাসের মাসতুতো দাদার বাড়িতে একটানা একমাস ছিলাম এবং এটাই ছিল আমার শাশুড়ির সাথে দিন যাপনের সর্বোচ্চ সময়কাল। বেহেলী ঐতিহ্যবাহী কৃষক আন্দোলনের ঘাঁটি। কাজের প্রয়োজনেই রোহিণী দাসকে এখানে আসতে হত মাঝে মাঝে। আমিও গিয়েছি কয়েকবার। কিন্তু কোথাও আমাদের স্থায়ী ঠিকানা ছিলনা এবং দু'জনের একত্র বসবাসের সুযোগও ছিল কম। আমি যখন শহরে তিনি তখন গ্রামে আবার আমি যখন গ্রামে, তখন তিনি হয়ত শহরে। নানকার আন্দোলন চলাকালে ঐ এলাকায় আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম। রোহিণী দাসও ছিলেন। সেখানে

মাস খানেক পেয়েছি তাঁকে আন্দোলনের একটানা ব্যস্ততার মাঝে, আবার ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ছিট্‌কে পড়েছি পরস্পর থেকে দূরে বহুদূরে। আমরা যখন চা বাগানের শ্রমিক-বস্তিতে তখন তিনি সুনামগঞ্জের হাজং এলাকার পাহাড়ে। '৫২ তে বড় মেয়ের জন্মের পর আমার ভেসে বেড়ানোর ক্ষেত্রগুলো সঙ্কুচিত হয়ে এলো। তখন প্রধানত পার্টি কমিউনেই বেশী সময় কাটাতে লাগ্‌ল। রোহিণী দাস গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। এক আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ রক্ত-সম্পর্কশূন্য বহু ভিন্ন পরিবারের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা কমিউনেই প্রথম সংসার পাতার অভিজ্ঞতা হ'ল- আমার স্বামী-কন্যা নিয়ে নিজস্ব সংসার পাতার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবু বহু মানুষকে নিয়ে দুঃখে-কষ্টে ডালভাত খেয়ে দিনগুজরান করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ ছিল। মা-বাবার সংসারে কুটোটি নাড়তে হয়নি। তারপর গ্রাম বা চা বাগানেও ঘর গেরস্থালির কোন কাজ করতে হয়নি। কিন্তু কমিউন জীবনে সব কাজই করতে হয়েছে- রান্নাবান্না, বাট্‌নাবাঁটা, জলতোলা, কাটাকুটি, ঝাড়পোচ কোন্‌টা নয়। যদিও সবার মধ্যে কাজের বন্টন হত তবু রোগী, শিশু এদের পরিচর্যা সহ কাজের পরিমাণ বড় কম ছিলনা। একে আর্থিক কষ্ট, দুবেলা খাবার সংগ্রহের চিন্তা, অন্যদিকে শারীরিক শ্রম, তাও আবার কেবল পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য শ্রম, রাজনৈতিক কাজের সুযোগ তো তখন আমাদের মেয়েদের সামনে প্রায় রুদ্ধ। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তাম। রোহিণী দাস যখন বাইরে থেকে আসতেন, তিনি আমাকে চাঙ্গা করে তুলতেন। নিজে কত যে সংসারের কাজ তিনি করতেন, ওসব বন্টনের অপেক্ষায় থাকতেন না। দিনের বেলা বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না, অতএব কমিউনের সাংসারিক কাজে হাত লাগানোর সুযোগ ছিল সবারই। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী কমিউনগুলোতে জীবন যাপনের পর '৫৮তে আমি বাধ্য হই ঢাকা এসে চাকরি নিতে। আমার আশ্রয় হ'ল দিদির বাড়ি আর রোহিণীদাস পড়ে রইলেন সিলেটে গোপন ডেনকে কেন্দ্র করে। বছরে মাত্র দুবার আমাদের দেখা হত, ছুটিতে মেয়ে নিয়ে আমি যেতাম সিলেটে। ১৯৬১-তে প্রথম নিজস্ব সংসার পাতার সুযোগ পেলাম আমার কোয়ার্টারে। কিছুদিনের মধ্যেই রোহিণী দাসও গুরুতর অসুস্থ হয়ে চলে আসলেন সিলেট ছেড়ে। আশ্রয় পেলেন আমাদের নিজস্ব সংসারে। তিনি আর কখনও সক্রিয় রাজনীতি করার মত শারীরিক সামর্থ ফিরে পেলেন না। তাঁর জীবন তখন মূলত বাড়ির চারদেয়ালের মধ্যেই গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ল। তখন আমার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে বাইরের জগতে, পেশাগত দায়িত্ব এবং শিক্ষক-সংগঠন আন্দোলনের কাজের চাপে রোহিণী দাসের সাথে দু'দন্ড বসে কথা বলব এমন সুযোগ খুব কমই পেয়েছি। তাঁর অতীত রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী সংরক্ষণের গুরুত্বও তেমন উপলব্ধি করতে পারিনি। '৬৯-'৭০ এর দিকে সত্যেন দা (সত্যেন সেন) আসতেন মাঝে মাঝে রোহিণী দাসের কাছে থেকে কৃষক আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু রোহিণী দাস বলতেন তিনি অনেক কিছুই সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারছেন না। স্মৃতিশক্তি তাঁর দুর্বল হয়ে গেছে। তবে ভাসা ভাসা

কিছু বিবরণ তিনি সত্যেনদাকে বলেছিলেন, সত্যেনদা তা নোট করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যেনদাও তাঁর কাজ শেষ করতে পারেননি। সত্যেনদার এই ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়াস আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তখনই প্রথম আমি কাজটির গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করতে শুরু করি, কিন্তু কাজটি আমি নিজে করার কোন উদ্যোগ নিইনি এটা এখন আমর বড় আফশোস্। রোহিণী দাসের নিজের পক্ষেও দীর্ঘ কোন কিছু লেখা তখন সম্ভব ছিলনা। তিনি তখন মাথার যন্ত্রণা এবং ব্রঙ্কাইটিস দুটো রোগেই ভুগছিলেন। '৮৭-তে যখন রোহিণী দাসের মৃত্যু হল তখন নারায়ণগঞ্জের কমিউনিস্ট পার্টি শাখা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাঁর জীবন নিয়ে ওরা একটি পুস্তিকা ছাপাবে। তখন ওরা আমাকে তাঁর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার অনুরোধ জানালো। কিন্তু আমি পড়লাম মহা সমস্যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁর কর্মকান্ড, কর্মক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। শরণাপন্ন হলাম আমার দেবীদার (বারীন দত্ত) কাছে। তাঁর কাছ থেকে খুবই সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পেলাম। তাই নিয়েই শুরু করলাম লিখতে। জানি এ লেখা হবে খুবই অসম্পূর্ণ। তাঁর জীবনের বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথাই থেকে যাবে অজানা। তবু লিখতে বসেছি সাহস করে। এ লেখায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসের চাইতেও তুলে ধরার চেষ্টা করব গরীব মেহনতী মানুষের প্রকৃত বন্ধু রোহিণী দাসের গুণাবলীকে, খাঁটি দেশপ্রেমিক, ত্যাগী ও সংগ্রামী এক কমিউনিস্ট চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে।

রোহিণী দেসের জন্ম হয়েছিল ১৯১০ সালে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার পুরান বারুঙ্কা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবার নাম রাধাগোবিন্দ দাস, মায়ের নাম ইন্দ্রমণি দাস। রোহিণী দাস মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার বড়। মেজ ভাইয়ের কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। তাঁর ছোট কাকার দিকে দুইভাই ও এক বোন জন্মেছিল। বোনটি বিয়ের কয়েক বৎসর পরেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। দুই ভাই এখনও জীবিত, দেশের বাড়িতেই থাকেন। পরিবারটির জীবিকার মূল উৎস ছিল জমিজমা, তবে জমিজমার পরিমাণও খুব বেশী ছিলনা। গোড়া থেকেই এই পরিবার একটি একান্নবর্তী পরিবার এবং আজও পর্যন্ত একান্নের বাঁধন অটুট রয়েছে। গ্রামের বাড়িকে কেন্দ্র করেই গোটা পরিবারটির জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা কেউ কেউ পড়াশুনা ও জীবিকার জন্যে এখন শহরবাসী হয়েছে।

খুব ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে হারান এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাকে ছেড়ে তিন মাইল দূরে বেহেলীগ্রামে তাঁর মাসীর বাড়ি চলে আসেন। পরে সেখান থেকে চলে যান মধ্যনগরে পিসীর বাড়িতে এবং ঐ বাড়িতে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এরপর সুনামগঞ্জ শহরে থেকে ম্যাটিক পাশ করেন। ম্যাটিক পাশ করার পর রাজনীতিতে জড়িয়ে

পড়ার কারণে তিনি আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বীয় জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি জ্ঞানের বিচিত্র জগতে তিনি বিচরণ করেছেন এবং সাধনা থেকে কখনও তিনি বিরত হননি।

প্রথমে স্কুলজীবনে তিনি একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সাথে যুক্ত হন। তারপর ১৯৩০-এ যখন সারা ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং গোটা দেশ এ আন্দোলনে মেতে উঠেছিল তখন তিনি ঐ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে বেশ কিছুদিন কারাগারে বন্দী জীবনও যাপন করতে হয়েছিল।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সিলেট জেলায় প্রথম পার্টির যে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটির অর্থ সংগ্রহ, ব্যয় ও হিসাবের দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়। ১৯৩৬-এ তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। সিলেট জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে স্থান লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি সব সময় জেলা কমিটিতে স্থান পেয়ে এসেছেন। যখন সারা আসামের জন্য আসাম প্রাদেশিক পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন প্রাদেশিক পার্টি কমিটিরও তিনি অন্যতম সদস্য-সংগঠক নিযুক্ত হন। দেশ বিভাগের পর পার্টির কঠিন দুর্যোগের সময় ১৯৫১ সালে তিনি সিলেট জেলা পার্টির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত তিনি সিলেট জেলায় আত্মগোপন অবস্থায় থেকে পার্টির দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য গোটা ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন (১৯২৫) হওয়ার পর থেকে ১৯৪২-এর আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ছিল। তাই এ সময়টা কমিউনিস্ট পার্টির কাজ গোপনেই করতে হয়েছে এবং প্রকাশ্যে কংগ্রেস ও কৃষক সংগঠন আন্দোলনের মাধ্যমে গণমানুষের মাঝে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে।

রোহিণী দাস তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মূলত কৃষক আন্দোলন-সংগঠন গড়ে তোলা ও পরিচালনার কাজের সাথেই যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সুনামগঞ্জে মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বিভিন্ন গ্রামে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। মধ্যনগর এলাকায় গৌরীপুরের জমিদারীতে হাটতোলা প্রথা অর্থাৎ খোদ্‌গারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনা করেন। বংশীকুন্ডার কৃষক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। ভাটি-পাড়ায় জমিদারী প্রথা, ধানুয়া খাজনা, বর্গা ও নান্‌কার প্রথার বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলন হয় তাতেও তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। সারা সুনামগঞ্জে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, মাছমারা ও গাছকাটার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে শক্তিশালী আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। এই

প্রত্যেকটি আন্দোলনই হয়েছিল সাড়া-জাগানো আন্দোলন, যা ঐ এলাকায় কৃষক আন্দোলন-সংগঠনের প্রথম ভিত্তি রচনা করেছিল। এ সময় কৃষকদের দাবী আসাম প্রাদেশিক পরিষদে জনপ্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরার জন্য সিলেট থেকে শিলং পর্যন্ত কৃষকদের যে ঐতিহাসিক লংমার্চ হয়েছিল সেই লংমার্চের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন রোহিণী দাস। প্রথমে সুনামগঞ্জে ও পরবর্তীকালে সারা সিলেট জেলায় কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন ও বিকাশের ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় লালাশরবিন্দু দে, বরুণসিন্ধু রায়, লালমোহন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, সুরথ পাল, মনীশ ভট্টাচার্য, রবি দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালে বেহেলী গ্রামে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যাকা (সিলেট ও কাছাড় জেলার সমন্বয়ে গঠিত ছিল) কৃষক সম্মেলনে তিনি সুরমা উপত্যাকা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। চল্লিশের দশকে সিলেট জেলার লাউতা-বাহাদুরপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে সারা এলাকায় নান্‌কার প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রচন্ড বেগবান নান্‌কার আন্দোলন গড়ে ওঠে, ১৯৪৯-এ যে আন্দোলন অনেক রক্তপাত ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে সেই আন্দোলন চলাকালে লাউতা-বাহাদুরপুর এলাকায় গিয়ে যে সব নেতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আশপাশের কৃষকদের-সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এ সময় কিছুদিনের জন্য নানকার মেয়েদের মধ্যে একজন কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে রোহিণী দাসসহ সব নেতার নেতৃত্বের ভূমিকা ও দিনরাত তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের চিত্র প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নান্‌কার আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর তৎকালীন পার্টি সম্পাদক বারীন্দ্র দত্ত এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রোহিণী দাস ছিলেন যৌথ নেতৃত্বের অন্যতম অংশীদার।

১৯৫০-এ তিনি চলে যান সুনামগঞ্জের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে বিপ্লবী হাজং কৃষকদের শিবিরে, পার্টির তৎকালীন উগ্রবাম হঠকারী নীতি অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও মুক্ত এলাকা গঠনে হাজং কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে। ঐ সময়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই হঠকারী নীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি, বিশেষভাবে মাঝারি কৃষক পর্যন্ত সবাইকে শ্রেণীশত্রু তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, ধনী ও মাঝারি কৃষকদের হত্যা ও সম্পত্তি লুটপাটের কর্মসূচীর ব্যাপারে তাঁর সায় ছিলনা। কিন্তু মনে অজস্র প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও জেলা কমিটির সভার বাইরে তিনি এসব উথাপন করেননি, পার্টি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে হাজং শিবিরে পড়েছিলেন এং দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে হাজং কৃষকদের সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন। হাজং এলাকার সংগ্রামে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন কমরেড রবি দাস ও প্রধান সহযোগী স্থানীয় নেতা কমরেড বৈষ্ণব হাজং। কিন্তু অল্পদিন পরেই রবিদা পুলিশের গুলিতে নৃশংসভাবে নিহত হন। পাহাড়ী এলাকায় সংগ্রামীদের শিবিরে থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করা বোধ করি সমতল এলাকার চাইতেও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য ছিল।

যদিও পাহাড়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকা সহজতর ছিল তবু শিবির-জীবনের কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়। খাদ্যাভাব, বিস্বাদ খাবার, শোওয়ার কষ্ট, বড় বড় জোঁকের উপদ্রব, শোওয়ার সময় মশারী খাটাতে ও গুজতে একটু অসতর্ক হলেই মুখের ভেতর পর্যন্ত জোঁক চলে যাওয়ার বিপদ, প্রতিদিন পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলের গ্রামে নেমে আসা, পুলিশী হামলার ঝুঁকি এড়িয়ে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করা আবার শিবিরে ফিরে যাওয়া সবই ছিল খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। রোহিণী দাসের মুখেই শুনেছি পাহাড়ে ওঠা-নামার পথে তাঁদের হাতে রাখতে হ'ত বাঁশের চটি। অনবরত অসংখ্য বড় বড় জোঁক পা বেয়ে শরীরের ওপর দিকে উঠতে থাকত আর ঐ বাঁশের চটি দিয়ে জোঁকগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে শরীর থেকে ফেলতে হত। হাতগুলো আর বিরাম নেওয়ার সুযোগ পেতনা। তবু সংগ্রামে বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর কর্মী ও নেতারা হাসিমুখে এসব কষ্ট সহ্য করেছেন।

আসলেই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে কাজ করা ও জীবন যাপন করা ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু রোহিণী দাস এ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং শুরু থেকে এই কষ্টকর জীবনটাই তাঁর প্রকৃত জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শহরে আসতেন সাময়িক প্রয়োজনে, গ্রামেই ছিল তাঁর স্থায়ী আশ্রয়স্থল। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি এবং যে কোন পরিবেশে যে কোন পরিবারে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। কাজের ক্ষেত্রে দুরন্ত গতিবেগ নিয়ে চলতে ভালবাসতেন তিনি। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যোগাযোগের দুরতিক্রম বাধাকে তিন অনায়াসে জয় করে নিতেন কেবলমাত্র নিজের পা দু'টো ও অসীম মনোবলের ওপর নির্ভর করে। কৃষক আন্দোলন ও পার্টির কাজে তাঁকে দেখা গেছে সিলেট জেলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কাঁঠে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে হেঁটে চলেছেন তিনি। ভোর বেলা রওয়ানা হয়ে একটানা হেঁটে দুপুরে কোন গ্রামে উঠে খেয়ে নিয়েছেন, আবার হাঁটতে শুরু করেছেন রাতে আর এক গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম নিয়েছেন। অবশ্য বর্ষাকালে ভাটি এলাকায় নৌকা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন।

কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি প্রথমে সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির কাজে, পরবর্তীকালে পার্টি সংগঠনের কাজে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। অর্থ সংগ্রহ, হিসাব সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। দেশবিভাগের আগে যখন সিলেট জেলা থেকে পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় তখন তিনি ঐ পত্রিকার ম্যানেজার নিযুক্ত হন, জ্যোতির্ময় নন্দী হন পত্রিকার সম্পাদক। 'সংহতি' অফিসের এক কোণেই রোহিণীদাস তাঁর থাকার জায়গা করে নিলেন এবং নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ , প্রচার ও বিক্রয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করতে লাগলেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁর এই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। নবজাত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের শ্রেণীশোষণ ও শাসনকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক খেলায় মেতে ওঠে, তাদের প্রধান শ্রেণীশত্রু কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প নিয়ে পার্টির ওপর চালায় তীব্র দমন-পীড়ন, হিন্দু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার চালিয়ে সাধারণ মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করে। শাসকগোষ্ঠীর অপপ্রচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কমিউনিস্ট মানেই হিন্দু, হিন্দু কমিউনিস্ট মানে ভারতের চর, যারা কিনা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। অতএব কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এ ধরনের মারাত্মক প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পার্টিকে আত্মগোপন অবস্থায় নতুন কায়দায় কাজ শুরু করতে হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৫১ সালে রোহিণী দাস যখন পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন পার্টির অস্তিত্ব রক্ষা ও নতুন করে পার্টিকে গড়ে তোলার এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। পুরানো জেলা নেতাদের অনেকেই নেই, বারীন্দ্র দত্ত ও চন্ডিদাস পূর্বপাকিস্তান পার্টি কমিটির দায়িত্ব পেয়ে চলে এসেছেন ঢাকায়, কেউ কেউ ভারতের কাছাড়ে অবস্থান নিয়েছেন। বহু হিন্দু কমরেড দেশত্যাগ করে চলে গেছেন, অনেকে কারাগারে আটক। কৃষক এলাকায় পার্টির গণভিত্তিগুলো বিপর্যস্ত (মূলত হিন্দু গণভিত্তি), এমনকি পার্টির হঠকারীনীতি ও পাকিস্তান সরকারের লাগামহীন তীব্র দমননীতি ও নির্যাতনের ফলে নানকার আন্দোলনে এলাকার সংগ্রামী মুসলিম নানকাররাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেখানকার পার্টিকর্মী ও সমর্থকরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, অনেকে ভারতের আসাম রাজ্যে চলে যায়। এমনি এক দুঃসময়ে রোহিণী দাসকে জেলা পার্টির হাল ধরতে হয়। তিনি এবং অন্য নেতারা উপলব্ধি করেন যে মুসলিম জনগণের মধ্যে ভিত্তি সৃষ্টি এবং মুসলিম কর্মী ও নেতা তৈরির কাজটাই পার্টির সামনে তখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি তখনকার ক্ষীণকলেবর জেলা কমিটিকে এই কাজে লাগান এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে অসীম ধৈর্য নিয়ে নিরলসভাবে এ কাজে লেগে থাকেন। রোহিণী দাসের এই কাজে অন্যতম সহযোগী ছিলেন জেলা নেতা দীনেশ চৌধুরী ও লালা শরদিন্দু দে তাঁদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে পার্টির চেহারা পাল্টাতে থাকে এবং পার্টি তাঁর বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠে, নতুন নতুন মুসলিম কর্মী পার্টিতে আসতে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ক্রমে জেলা কমিটিতেও অন্তর্ভুক্ত হন। এটা ঠিক সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শান্তি আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন এই সাফল্য অর্জনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। তবে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পার্টিকে পুষ্ট করার মধ্যেই জেলা কমিটির কৃতিত্ব নিহিত। জেলা সম্পাদক হিসেবে এ সময় একদিকে রোহিণী দাসঁকে পার্টির আন্ডার-গ্রাউন্ড যন্ত্র তৈরি ও গোটা পার্টির নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে, অন্যদিকে পার্টির অস্তিত্ব ও বিকাশের মূল গ্যারান্টি জনস্বার্থে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ার মাধ্যমে মুসলিম জনগণের মধ্যে ভিত্তিমূল

স্থাপনের জন্য যোগসূত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। যদিও আত্মগোপন অবস্থায় তীব্র আর্থিক সংকটের মোকাবেলা করে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া ছিল খুবই দুরূহ। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে তিনি এবং জেলা কমিটির সদস্যরা যৌথভাবে এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।

একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের শ্রেষ্ঠ যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে জাত-পাত ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সবাইকে মানুষ বলে গণ্য করা, মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারা, তাদের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করা এবং সাধারণ মানুষ ও দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকার ক্ষমতা। রোহিণী দাসের মধ্যে এই গুণগুলোর উপস্থিতি আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করেছি। তিনি যখন যে পরিবারে থেকেছেন সেই পরিবারই হয়ে উঠেছে তাঁর পরমাত্মীয়। যে-কোন পরিবারে থেকে তাদেরই একজন হয়ে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে যা দিয়ে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন তা হচ্ছে প্রতিটি পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্ম হয়ে পারিবারিক সমস্ত ছোটবড় সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, অসুখে-বিসুখে রোগীর সেবা যত্ন - এক কথায় পরিবারের সমস্ত কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা দান। রোগীর সেবাযত্নের কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। সাধারণ রোগ-ব্যধিতে তো বটেই, এমনকি কলেরা রোগীর সেবার প্রয়োজনেও তিনি ছুটে যেতেন সর্বাগ্রে এবং রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করতেও কখনও দ্বিধা করতেন না। তাঁর সেবার গুণে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে এমন কাহিনী ঐ সব পরিবারের মুখেই আমি শুনেছি, পরবর্তীকালে নিজেও তা প্রত্যক্ষ করেছি। রোগীর ঔষুধ-পথ্য খাওয়ানো, মাথা ধোওয়ানো, গা মোছানো, বিছানা জামা-কাপড় পাল্টানো, কোন কাজেই রোগী যাতে কষ্ট না পায় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর থাকত এবং এসব কাজের চমৎকার কৌশলও জানা ছিল তাঁর। এ সব মানবসেবার কাজ ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। মানুষের জন্য ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ, দেশের জন্য ছিল সীমাহীন ভালবাসা। তাই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন দেশ ও গণমানুষের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনার লক্ষ্যে।

যে বেহেলীগ্রামে তাঁর শৈশবকাল ও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন কেটেছে সেই গ্রামের কৃষক পরিবারই হোক অথবা বাবুদের পরিবারই হোক সর্বত্র তাঁর অসাধারণ রাজনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত- এই গ্রামে কংগ্রেসী দুর্গ ভেদ করে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তার ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশে কমরেড রোহিণী দাসের অনন্য অবদান ছিল। বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল জোয়ারে এই এলাকার নারীসমাজের মধ্যে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই জাগরণ আরও বেশী বেগবান হয়ে ওঠে রোহিণী দাসের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রভাবে। তাঁর মা থেকে শুরু করে তাঁর বৌদিরা, বোনেরা, কৃষক পরিবারের মেয়েরা সবাই স্বাধীনতা আন্দোলনে, মিছিলে, সভায় প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়েছিলেন। বেহেলী

গ্রামের এমন দু'টি পরিবারের কথা উল্লেখ করব যে পরিবারে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পেছনে রোহিণী দাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এর মধ্যে একটি পরিবার হচ্ছে পরম শ্রদ্ধেয় করুণাসিন্ধু রায়ের পরিবার। শ্রী রায় ছিলেন তাঁর আপন বড় ভাইয়ের মত। তাঁর অতি প্রিয় বড়দা। বড়দা প্রথমে ছিলেন গোঁড়া কংগ্রেসী। রোহিনী দাস ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের সাথে রাজনীতি নিয়ে তাঁর তুমুল তর্কবিতর্ক হত। তবে পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হতে তাঁর দেরি হয়নি। দ্রুতই কমরেড করুণাসিন্ধু রায় সারা সুনামগঞ্জ এলাকায় অতি জনপ্রিয় কৃষকনেতা হয়ে দাঁড়ান। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান করুণা রায় ছাত্রাবস্থা থেকে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের পদে উন্নীত হয়। রায় পরিবারে শুধু বাপ-বেটাই নন, ঐ পরিবারের নান্‌কার দাসীদের সন্তানেরাও পার্টি সদস্যপদ লাভ করেছিল। আত্মগোপন অবস্থায় একই ডেরায় ঐ সব কমিউনিস্ট নান্‌কার-সন্তানদের সাথে দীর্ঘ দিন রোহিণী দাস কাটিয়েছেন আপন মামা-কাকার মতই। যারা ছিল সমাজে দারুণভাবে উপেক্ষিত তারা পেল সত্যিকারের মানুষের সম্মান। রোহিণী দাস তাদের রাজনৈতিক বিকাশের প্রতি ছিলেন বিশেষ যত্নবান। তিনি ওদের সবসময় সতর্ক করে দিতেন যেন তারা কখনও তথাকথিত ভদ্রলোকদের বাহ্যিক চাক্‌চিক্য, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার, স্বভাবের দোষ-ত্রুটি ও কুঅভ্যাস গুলো দ্বারা প্রভাবিত না হয়। রায় পরিবারেরই এক কন্যা ছোটবোন স্থানীয়া লতিকাদি ও তার স্বামী কামিনীরায়ের পরিবারের সাথেও রোহিণীদাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এই পরিবারের ছেলেরাও কমিউনিস্ট আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বেহেলীগ্রামের আর একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করতে হয় যে-পরিবারে রোহিনী দাস কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, পরিবারেরই একজন হয়ে এবং সুযোগ্য অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এই পরিবারটি হ'ল বিখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ও পল্লীগীতি গায়ক প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরীদের পরিবার।নির্মলের বাবা নলিনী চৌধুরী ও তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন গোঁড়া কংগ্রেসী। কিন্তু রাজনৈতিক মত-পার্থক্য সত্ত্বেও রোহিণী দাসকে নির্মলের বাবা আপন ছোটভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন এবং পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। নির্মলকে গণনাট্য সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টিতে টেনে আনার ব্যাপারে রোহিণী দাসেরই মুখ্য ভূমিকা ছিল। মাঝখানে এক পর্যায়ে নির্মলকে তার বাবা ধানের ব্যবসাতে লাগিয়ে ছিলেন এবং তার শিল্পী জীবন ধ্বংস হতে চলেছিল। রোহিণী দাসই তাকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন এবং তাকে তার শিল্পী জীবনে ফিরিয়ে আনেন, যার ফলে নির্মল এক সময়ে সারা ভারতের অন্যতম সেরা পল্লীগায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। নির্মলের অন্যান্য ভাইবোনেরাও তাদের কাকাবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে সেবার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সেবা তার নিজ জীবনে পার্টির আদর্শের জন্য ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং আজও তার সহযোদ্ধা স্বামী অনিমেষকে (সিলেটের এককালীন ছাত্র

কমরেড বর্তমানে অসুস্থ, পঙ্গু) নিয়ে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন সবাই ভারতে। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি এই সব পরিবারের ওপর রোহিণী দাসের এমনই এক সম্মোহনী প্রভাব ছিল যে তাঁর মতামত বা উপদেশকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। অবশ্য তাঁর মতামত খুবই যুক্তিপূর্ণ যা কেউ খন্ডাতে পারতেন না।

জনগণের মনকে জানার জন্য তিনি যেমন সব সময় কৌতূহলী ছিলেন তেমনি তাদের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতেও পারতেন অতি সহজে। জনগণের সমস্যা, আশা-আকাংঙ্খা ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। এই দূরদর্শিতার জন্যই পার্টির বিভিন্ন সময়ের লাইন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি যে সব সমালোচনা ও মতামত তুলে ধরতেন পরবর্তী সময়ে অনেক ক্ষেত্রে তা সঠিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর যখন তিনি জনগণ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েন তখনও পরিস্থিতি অনুধাবনের যে বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল তা তিনি হারিয়ে ফেলেননি। অসুস্থ অবস্থায় যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তাঁদের মাধ্যমে জনগণের মনমেজাজ বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তিনি।

তিনি যখন অসুস্থ হয়ে নারায়ণগঞ্জে আমার কোয়ার্টারে চলে আসেন এবং যখন তাঁর চলাফেরা প্রধানত বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তখনও তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের কাজ থেকে বিরত ছিলেন না। যাঁরাই বাড়ীতে আসতেন তাঁদের সাথেই তিনি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। নারায়ণগঞ্জে পার্টির পুনর্জন্ম ও বিকাশের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। এখানকার তরুণ নবাগত পার্টি সদস্যদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি তাদের উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে সবসময় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। কোন পার্টিকর্মীর মধ্যে কমিউনিস্টসুলভ মানবিক গুণাবলীর অভাব দেখলে তিনি দুঃখ পেতেন। দিনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় তিনি কাটাতেন রাজনৈতিক পড়াশুনায়। চোখ ও মাথার যন্ত্রণার জন্য একটানা বেশীক্ষণ পড়তে পারতেননা, তবু দৈনিক পত্রিকা থেকে শুরু করে 'একতা', 'New Times' সহ রাজনৈতিক বইপত্র যেভাবেই হোক পড়ে শেষ করতেন। এ সব পত্র-পত্রিকা তাঁর কাছে ছিল জীবনতুল্য। তিনি ঘরে বসেই 'একতা' পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করেছিলেন ৫ জন। তিনি নিজেই তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে একটি খামে রাখতেন এবং একটি খাতায় তার হিসাব রাখতেন। মৃত্যুর এক বৎসর আগে যখন তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তখনও তিনি এই কাজটি চালিয়ে গেছেন। তাঁর সর্বশেষ সংগৃহীত টাকার খামটি বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেছে তাঁর মৃত্যুর পর, খামের গায়ে লেখা রয়েছে 'একতা'। মৃত্যুর একমাস আগে যখন তিনি হাসপাতালে, যখন তাঁর চেতনায় দেখা দিয়েছে বৈকল্যের লক্ষণ, দৃষ্টি হয়ে আসছে ঘোলাটে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তখনও তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান

পার্টি ও তার আদর্শ, গণমানুষের রাজনীতি ও রাজনৈতিক জগৎ। প্রত্যেক দিন হাসপাতালে তাঁকে পত্রিকা পড়ে শোনাতে হত। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন রাজনীতির প্রশ্ন, বিশেষ করে গরবাচেভ, গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রোইকার সর্বশেষ খবর জানতে চাইতেন।

রোহিণী দাস একজন সত্যিকার অর্থে আত্মনিবেদিত কমিউনিস্ট বিপ্লবী ছিলেন। মায়ের একমাত্র সন্তান হয়েও মায়ের দায়িত্ব খুড়তুতো ভাইদের ওপর ছেড়ে দিয়ে, মায়ের সান্নিধ্য ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জনগণের সংগ্রাম, সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে। মায়ের চোখের জল তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি। অবশ্য মা-ও উপলব্ধি করতেন তাঁর সন্তানের আদর্শ- তাই একমাত্র ছেলেকে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি বরং তাঁকে ও তাঁর পার্টিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি সর্বদা হাত বাড়িয়ে দিতেন। বাড়ি ঘর বিষয়-সম্পত্তির প্রতি কমরেড দাসের কোন আসক্তি বা মোহ ছিলনা, ব্যক্তিগত কোন উচ্চাভিলাষও ছিলনা। শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্য অর্জনই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্খা।

তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন নিঃস্বার্থ ত্যাগী পুরুষ। তিনি যখন যেখানে থেকেছেন, পরিবারে অথবা পার্টি কমিউনে, সব সময় তিনি নিজের সুখ-সুবিধার চাইতে অন্যের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে বেশী যত্নবান ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, পার্টি কমরেড বন্ধু-বান্ধব যে কেউ বাড়িতে অতিথি হয়ে আসুক না কেন তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে তবে তিনি নিজে খেতেন, প্রয়োজনে নিজের খাবার ভাগ করে ক্ষুধার্ত অতিথিকে খাইয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। অতিথিদের শোয়ার ব্যবস্থাও তিনি নিজ হাতে করে দিতেন। যখন তিনি রোগশয্যাশায়ী তখনও তিনি শুয়ে শুয়ে খোঁজ নিতেন সবার ঠিকমত খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। বাড়িতে অনেক সময় অনেক আত্মীয় বা পার্টিকর্মী নানাকাজে দীর্ঘ দিন থেকেছে। তিনি তাদের সবাইকে নিজ পরিবারভুক্ত সদস্যের মতই আপন করে নিতেন। বাড়ির কাজের লোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কমিউনিস্টসুলভ মানবিক, তাই তাঁদের সাথে তার আচরণও ছিল মানুষের প্রতি মানুষের যে রকম আচরণ হওয়া উচিত, ঠিক সে রকমটি। আমাদের পার্টি-জীবনে এবং আমার চাকুরী-জীবনে অর্থনৈতিক সংকট ছিল চিরসঙ্গী। এই সংকটের মধ্যে থেকেও দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্ত। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিযপত্র রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। কিন্তু কারো প্রয়োজনে নিজের জিনিসের প্রতি মোহ ত্যাগ করে অন্যকে দিয়ে দিতে তিনি ইতস্তত করতেন না। তিনি বলতেন কোন জিনিসের প্রতি মোহ রাখতে নেই, মোহ থেকেই স্বার্থপরতা জন্ম নেয়। তিনি তাঁর নিজের বাড়ির ওপর দাবীও পরিত্যাগ করে গেছেন। তিনি মনে করতেন যে খুড়তুতো ভাইয়েরা তাঁর মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছে তাদেরই অধিকার রয়েছে ঐ বাড়ি-সম্পত্তির ওপর। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর একমাত্র আকাঙ্খা ছিল তাঁর

মেয়ে দু'টি যেন লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয় এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে অবদান রাখতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। নিজের কাজ নিজে করতেই তিনি ভালবাসতেন। ছোট-বড় কোন কাজে তাঁর অনীহা ছিলনা, মেরামতি কাজ থেকে ঝাটপাট সব কাজেই তিনি যেমন ছিলেন দক্ষ তেমন যত্নশীল। যে-কোন কাজ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না। শেষের দিকে যতই তাঁর শরীর বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ছিল ততই তাঁকে ধীরে ধীরে পরনির্ভরশীল হতে হচ্ছিল। এই পরনির্ভরতা ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। শারীরিক কষ্টের মধ্যেও তিনি চেষ্টা করতেন অন্যকে কষ্ট না দিয়ে কোন্ কাজটা নিজে করা যায়।

কমরেড দাসের আর একটি আশ্চর্য গুণের কথা না বললে তাঁর সম্পর্কে কথা অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। বিপদে-আপদে রোগে-শোকে কখনও তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। ধৈর্য ও সাহস নিয়ে তিনি সবরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারতেন। তাঁর নিজের কঠিন অসুস্থতার সময়ও তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েননি। '৭২ থেকে শুরু করে প্রতি বছর তিনি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন, আবার ঘরে এসে গা ঝাড়া দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয় তাঁর স্নায়ু ও মনোবল এত শক্ত ছিল যার জন্য অসুস্থ হওয়ার পর দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশি সময় তিনি বাঁচতে পেরেছিলেন।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে আমার স্বামী বলেই আমি তাঁর এত গুণের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার বক্তব্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। বরং আমার মনে হচ্ছে যে প্রকাশের অক্ষমতার জন্য মানুষটির সঠিক রূপ আমি তুলে ধরতে পারছি না।

তবে এটা ঠিক যে তাঁর চরিত্রে যে সব গুণাবলী লক্ষ্য করা গেছে এবং তাঁর কমিউনিস্ট জীবনে যে সব গুণের বিরামহীন বিকাশ ঘটে সে সব গুণ আরও অনেক কমিউনিস্টের মধ্যে ছিল এবং আজও হয়ত অনেকের চরিত্রে এই সব গুণ বিকশিত হচ্ছে। শুধু কমিউনিস্ট কেন, কমিউনিস্ট নন এমন অনেক দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেখেছি যাঁরা দেশের জন্য, মানুষের জন্য চরম আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, যাঁদের মানুষের প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা এবং যাঁরা তাঁদের চরিত্রের গুণাবলী ও নিঃস্বার্থ দেশ সেবার দ্বারা মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আজও যখন রাজনীতিবিদদের ওপর মানুষের আস্থা শিথিল হয়ে পড়ছে, এমনকি কমিউনিস্টদের চরিত্রের ওপরও ভরসা রাখতে পারছেনা, তখনও দেশে উন্নত চরিত্রের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক কর্মী ও নেতার একেবারে আকাল পড়েছে বলে মনে হয় না। যে কোন খাঁটি দেশপ্রেমিক বা কমিউনিস্টের জন্য এই গুণাবলী অর্জন অস্বাভাবিক কিছু নয়, অসম্ভবও নয়। অথচ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ সব গুণাবলীর বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। সর্বোপরি একজন

কমিউনিস্টকে অবশ্যই হতে হবে সেরা দেশপ্রেমিক, সেরা মানবপ্রেমিক, নিষ্ঠায় ত্যাগে ও কর্মে আদর্শস্থানীয় এবং একজন খাঁটি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী, রোহণীদাস আদর্শস্থানীয় কমিউনিস্টদের এমনি একজন প্রতীক।

কমরেড দাসের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে লেখা ও আমার কাছে লেখা অনেক চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ সব উদ্ধৃতি থেকে কিছুটা বোঝা যাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও আত্মীয়রা তাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন :

১। 'কালান্তর'-এ (সি.পি.আই. পশ্চিমবঙ্গ শাখার মুখপত্র) কোলকাতা ১৭ জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত সিলেটের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড জ্যোতির্ময় নন্দীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি-

> আন্দোলনকে তিনি তাঁর সংগঠনী প্রতিভা বলে একদিকে যেমন বহু ছাত্র এমনকি কৃষক যুবককেও সত্যাগ্রহ সংগ্রামী করে তুলেছিলেন তেমনি তাঁর অমায়িক মিষ্ট ব্যবহার ও নীতিনিষ্ঠা দ্বারা বিশেষ করে কর্মকেন্দ্র বেহেলি অঞ্চলের বহু পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন।"
>
> "জননেতা বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না, কিন্তু জননেতাদেরও বিশেষতঃ আর্থিক ব্যাপারে তাঁর অনুশাসন দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিতে দেখেছি।"
>
> "তার এই নীরব অথচ অত্যন্ত কুশলী ক্ষমতার দরুন জেলাতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন থেকে যে প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয় তাতেও রোহিনী স্থান পান।"

২। ঢাকা থেকে ৯ই জানুয়ারী, ১৯৮৭-তে প্রকাশিত জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র **'গণশক্তি'** পত্রিকায় মুদ্রিত বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃতি (বিবৃতি দাতাদের অন্যতম কমরেড আছদ্দর আলী সিলেটে রোহিণীদাসের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন)-

> "কমরেড রোহিনী দাস উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠকদের অন্যতম। তিনি উনিশ শত ত্রিশের দশকে তৎকালীন আসাম প্রদেশ এবং সুরমা উপত্যাকার সিলেট জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন।..........প্রতিকূল অবস্থায় পার্টির কাজে অমানুষিক খাটুনীর জন্যই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

৩। আমার কাছে লেখা ময়মনসিংহ জেলার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী) কমরেড জিতেন সেনের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি-

> "সারাজীবন এমনি রোগশয্যায় শুয়েও রোহিনীদার ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা সব কিছুই পার্টি ও তার কর্মীদের নিয়ে। শোষণমুক্ত নয়া সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন তাঁর জীবনে সফল হোলনা-তোমরা, আগামী দিনের

> কর্মীরা তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পারবে এটাই আমার মত পরপারের যাত্রীর ঐকান্তিক কামনা ও আশীর্বাণী।"

৪) সিলেট জেলা পার্টির অন্যতম প্রবীণ নেতা কমরেড লালমোহন রায় সুনামগঞ্জ থেকে যে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন–

> "দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি সে অনুপ্রেরণা জীবন সায়াহ্নেও পাথেয় হিসাবে থাকবে।"

৫) দিল্লী থেকে আমার সেজদা, সিলেট জেলা পার্টির এককালীন সম্পাদক কমরেড সত্যব্রত দত্ত তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন–

> "--------কিন্তু রোহিনীদা দেশত্যাগের প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য। আজীবন জনগণের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছেন। সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বস্ব পণ করে জনগণের সেবা করেছেন। চরম অসুস্থতার মধ্যেও জনগণের কাছ থেকে দূরে যেতে চাননি। তাই তিনি মহান। তাঁর মহান চিন্তা, অসীম মনোবল, প্রচন্ড সাহসিকতা, অসাধারণ ধীশক্তি, আর সুনির্মল চরিত্র ও স্নেহ প্রবনতা আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিল। আমাদের পরিবারে তিনি অভিভাবক স্থানীয় ছিলেন। তাই দূরে থেকে সর্বদাই তাঁর অভাব অনুভব করতাম। তাঁর আদর্শই সেই অভাব পূরণ করত।"

৬) কলকাতা থেকে আমার কাছে লেখা চিঠিতে আমার ছোটদা (সিলেট জেলার এককালীন ছাত্র নেতা গণনাট্য শিল্পী)কমরেড দেবব্রত দত্ত উল্লেখ করেছেন–

> "রোহিনীর আদর্শ নিষ্ঠা ও মানসিক দৃঢ়তা আমাদের আদর্শস্থানীয়। তাই তার জীবন ও কর্ম আমাদের সকলকে সব সময়ই অনুপ্রেরণা যোগাবে। তুমিও তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কর্মপথে চলতে থাকবে তার মহান আদর্শকে রূপায়ণের জন্য।

৭) শেরপুর থেকে প্রগতিশীল কর্মীদের পক্ষে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা কমরেড রবি নিয়োগী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন–

> "মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথিকৃৎ রোহিনীবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনা বোধ করছি। তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের উজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।"

দেশের স্বাধীনতা, শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লক্ষ্যে তিনি যেমন জীবন বাজি রেখে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন তেমনি

জীবনে ও মরণে কমরেড রোহিণী দাস পেয়েছেন একজন বিপ্লবী কমিউনিস্টের উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান, অর্জন করেছেন জনগণের ও পার্টিকর্মীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও গভীর আস্থা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে সিলেট জেলা কমিটি এবং সর্বশেষে নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি, কমরেড দাসের গুণগ্রাহী শুভাকাঙ্খিরা তাঁর দীর্ঘ অসুস্থতার সময় যে ভাবে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার কাজে সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছেন তার কোন তুলনা হয়না। শেষ জীবনে নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি ও তাঁর কর্মীদের সাথে কমরেড দাসের নিবিড় সম্পর্কের কথা আবারও উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি যেমন এই জেলার নব প্রজন্মের তরুণ কিশোর কমরেডদের অসীম স্নেহভরে জড়িয়ে ধরেছিলেন তেমনি তারাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আন্দোলন, সংগ্রাম সংগঠনের বিরামহীন ব্যস্ততার মাঝেও তারা তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে, আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনার প্রত্যয় দিয়ে তাঁর মনকে আশায় ভরে দিয়েছে। বিশেষ করে তাঁর রোগশয্যায় জেলা কমিটির নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কর্মীরা যে অর্থ ও শ্রম দিয়ে তাঁকে বাঁচাবার প্রাণপণে প্রয়াস চালিয়েছে তা পিতৃতুল্য কমিউনিস্টের প্রতি নবপ্রজন্মের কমিউনিস্টদের ঐকান্তিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৯৮৭-এর ৩রা জানুযারী সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কমরেড রোহিণী দাস চিরকালের মত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেদিন ছিল পার্টির নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সম্মেলনের সমাপ্তি দিন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমিউনিস্টরা হাজির হয়েছেন শহরের পৌর পাঠাগারে। তাঁর মৃত্যুলগ্নে সেখানে শুরু হয়েছে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কমরেড দাসের মৃত্যু সংবাদ সেখানে পৌঁছামাত্র নেমে আসে গভীর শোকের কালো ছায়া। ছুটে আসেন সবাই তাঁর মরদেহের পাশে। লাল পতাকা আচ্ছাদিত তাঁর নিথর দেহ ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। যদিও নারায়ণগঞ্জ কমরেড দাসের কর্মস্থল ছিলনা তবু তার পরম সৌভাগ্য যে শেষকৃত্যে ও শোকসভায় রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্বিশেষে বহুলোকের সমাগম ও শ্রদ্ধা নিবেদন তাঁর মৃত্যুকে করেছে মহীয়ান এবং তিনি পেয়েছেন তাঁর উৎসর্গীকৃত সংগ্রামী জীবনের গৌরবময় স্বীকৃতি ও সম্মান।

হেনা দাস। জন্ম ১৯২৪। জন্মস্থান সিলেট শহর। আজীবন সংগ্রামী তিনি, জীবনের কর্মময় দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন নারী-মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে - স্বদেশভূমির রাজনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে।

ছোটবেলা থেকেই যাঁর হাতে খড়ি সমাজসেবায় ঘরোয়া সংগঠন কিংবা গঠনমূলক কর্ম-তৎপরতার সূত্রে - কৈশোর পেরোতে না পেরোতেই যাঁর পরিচয় ঘটেছে সমাজের অন্ধকার দিকগুলির সঙ্গে, শোষণ অনাচার শ্রেণী-বৈষম্য প্রভৃতি সমাজ-প্রগতির পরিপন্থী বিষয়াবলী তাঁকে ভাবিয়ে তোলে গোড়া থেকেই। আর সে-কারণেই তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন একজন আত্মত্যাগী কর্মী হিসেবে। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের বৈচিত্র্যময় কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেন। স্বামী রোহিণী দাস অসুস্থ হয়ে পড়ায় জীবিকান্বেষণে যোগদান করেন শিক্ষকতার পেশায়। নারায়নগঞ্জের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। আর এরই মাধ্যমে শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষকদের আন্দোলনেও অংশ নেন। অবসর গ্রহণ করেছেন নারায়নগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ থেকে ১৯৮৯ সালে। তিনি ১২ বছর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। বর্তমানে ওই সংগঠনেরই সিনিয়র সভাপতি।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র 'গণশিক্ষা'-র তিনি সম্পাদিকা। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে দু'টি গ্রন্থ : 'স্মৃতিময় দিনগুলো' ও 'স্মৃতিময়-৭১'। 'উজ্জ্বল স্মৃতি' গ্রন্থাকারে তৃতীয় রচনা। অবসর জীবনে বসবাস করছেন নারায়নগঞ্জে - বড় মেয়ের সঙ্গে। এখনও অক্ষুন্ন তাঁর সংগ্রামী মন-মানসের কর্ম-প্রক্রিয়া- সমাজকল্যাণে, মানব কল্যাণে প্রগতির স্বার্থে এখনও তেজোদীপ্ত।

মানব প্রকাশন প্রকাশনা-১০ ISBN -984-8148-06-X